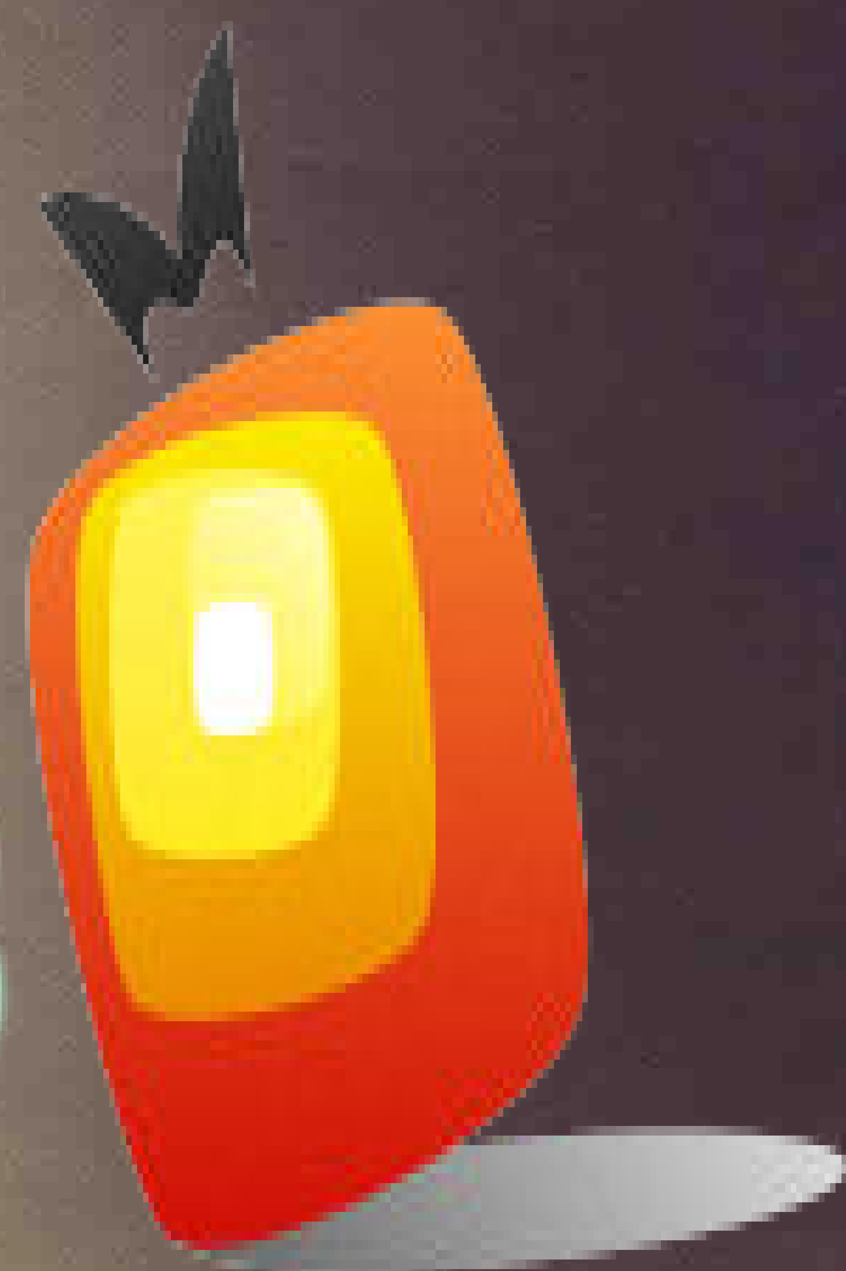
ফিরে এসো, সুন্দরীতমা

আনিসুল হক





ফিরে এসো, সুন্দরীতমা

উৎসর্গ

ধ্রুব এষ
প্রিয় শিল্পী, প্রিয় মানুষ

ভূমিকা

এই উপন্যাসটি ঈদসংখ্যা প্রথম আলো ২০০৭-এ প্রকাশিত হওয়ার পর একজন পাঠিকা আমাকে চিঠি লেখেন। কয়েকজন পাঠকের সঙ্গে সরাসরি কথাও হয়। তাঁদের বক্তব্য, সুন্দরীতমাটি যদি চলেই গেল, তাকে যদি এত ভালোবাসা দিয়েও ফিরিয়ে আনা যাবে না, তাহলে আমাদের আশার জায়গা কোথায়? আমি যেন উপন্যাসটির পরিণতিটি পাল্টে দিই।

হয়তো তা-ই উচিত। কিন্তু আমি এই কাহিনীর শেষটা পাল্টাতে চাই না। এই আঘাতটা আমাদের পেতে হবে। অন্তত উপন্যাসে।

বাস্তব জীবনে যাঁরা এই সমস্যাটির মধ্যে আছেন, তাঁদের বলি, চেষ্টা আর আশা, কোনোটাই ছাড়বেন না। অনেকেই ফিরেছেন। ফেরা যায়। ফেরা সম্ভব। কেবল নিজেকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে কঠিনভাবে, ইস্পাতকঠিন প্রতিজ্ঞা আর উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে ফিরে আসা সম্ভব, অবশ্যই সম্ভব।

আনিসুল হক



রাত দেড়টার সময় সে এসেছিল আমার জীবনে। চলেও গিয়েছিল আরেক রাতে–দেড়টায় কি দুটোয়, ১১ মাস পরে। আকাশে চাঁদ ছিল কি না, দুই রাতের কোনো রাতে, তা আমি খেয়াল করিনি; করবার কোনো উপায় ছিল না। তার নাম দিই সুরঞ্জনা, জীবনানন্দ দাশের কবিতা থেকে ধার নিয়ে। যেন বলা যায়, *সুরঞ্জনা, ওইখানে যেয়ো নাকো তুমি, বোলো নাকো কথা ওই যুবকের সাথে; ফিরে এসো সুরঞ্জনা : নক্ষত্রের রূপালী আগুন ভরা রাতে।* কিন্তু তাও হয়তো নয়, কারণ এই কবিতাটার প্রথম দুটো চরণ, তাকে বলা যায়, বলা উচিত, ওইখানে যেয়ো নাকো তুমি, কিন্তু 'ফিরে এসো সুরঞ্জনা' বলে আমি কি আর তাকে ডাকব? কোনো দিন? দ্বিধান্বিত থাকি এই বিষয়ে, দ্বিধা যায় না।

দুঃস্বপ্নের রাতে সে যখন মাঝেমধ্যে ফিরে আসে, আমি ঘুমের মধ্যেই গোঙাতে থাকি, শীতের রাতে ঘেমে যাই, গরমের রাতে কুঁকড়ে যাই ঠান্ডার সুচ বিদ্ধ হয়ে; ঘুম ভেঙে যাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পর সংবিৎ ফিরে পেলে বুঝি, সে আর নেই, সে আর আসবে না, সঙ্গে করে আনবে না সেই ভয়াবহ শ্বাসরোধী দিনগুলো, মৃত্যুঘন মুহূর্তগুলো, নিরুচ্চারিত আর্তনাদগুলো...কী যে আরাম লাগে...

অথচ সে ছিল—সুরঞ্জনা, জ্যোৎস্নার মতো, টগর কি কাঁঠালচাপা ফুলের মতো। মেঘের ফাঁকে চাঁদ কিংবা পাতার ফাঁকে হালকা হলদেটে ফুল, এই রকম উপমায় কাছের জিনিসকে সুদূরের মনে হতে পারে, কিন্তু সে যে কী রকম সুন্দরী ছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করতেও পারছি না। তার কাছে এমনকি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরীকেও মনে হতে পারে ম্লান; অন্তত আমার তা-ই মনে হয়েছিল।

তার চেয়ে কোনো রূপবতী কাউকে আমার জীবনে দেখিনি; এমনকি ছবিতেও না; এমনকি ঐশ্বরিয়া রাই, সিন্ডি ক্রফোর্ড, মাধুরী দীক্ষিত, সালমা

হায়েক, জুলিয়া রবার্টসের চেয়েও তাকেই আমার সুন্দর মনে হয়েছিল। সে-ই ছিল, আমাদের কালে, এই পৃথিবীর সুন্দরীতমা।

কেবল তাকেই বলা যায়, বলা যেতে পারত—প্রিয়তমা সুন্দরীতমারে, যে আমার উজ্জ্বল উদ্ধার। কিন্তু সে আমার জন্য উজ্জ্বল উদ্ধার না হয়ে হয়ে উঠেছিল প্রচণ্ড এক পতন, বীভৎস এক বিভীষিকা।

তবু সে ছিল সুন্দর। বিদ্যুৎরেখার মতো সুন্দর ছিল সে, তাই সঙ্গে করে এনেছিল বজ্র। তাকে নিয়েই রচনা করা যায় 'সুন্দরের ফণা' এই তুলনাটি। সুন্দরবনের কোনো বাঘিনী তার ডোরাকাটা হলুদ সৌন্দর্য নিয়ে হঠাৎ করে মানুষখেকো হয়ে উঠলে যে রকম লাগতে পারে, তাকে নিয়ে হয়তো সে রকম চিত্রকল্পও ভাবা যায়।

সুরঞ্জনা আমার জীবনে যে রাতটিতে এসেছিল, তার বর্ণনা কেবল হিন্দি টিভির সিরিয়ালেই পাওয়া যেতে পারে।

রাত বাজে একটার মতো। ঢাকা শহর অনেকটাই ঘুমিয়ে পড়েছে, যেমন যায়। কিন্তু বাসস্ট্যান্ডগুলোয় নিশিযানসমস্তের সামনে ইতস্তত ভিড়, *দৈনিক বাংলার* মোড়ে শহিদের দোকানে গরম পরাটা আর ডিম ভাজার সামনে ক্ষুধিত খদ্দেরের প্রসারিত হাত—এর সবই ছিল সে রাতে, যেমন থাকে।

শীতের সেই রাতটিতে ছিল কুয়াশা, কুয়াশার মশারির গায়ে ভেসে এসে লাগছিল সোডিয়ামের হলুদ আলোর রেণুগুলো। কতিপয় ছিন্নমূল শিশু আশ্রয় খুঁজে নিয়েছিল সরকারি অফিসের বারান্দায় আর যাত্রীছাউনিগুলোর নিচে, ক্লিন্ন কাঁথার নিচে জড়াজড়ি করে। পাশেই সোডিয়াম আলোকে জ্যোৎস্না ভেবে চন্দ্রগ্রস্ত হয়ে অকারণে ছোটাছুটি করছিল কয়েকটা কুকুর, যেমন করে।

আমি ছিলাম ঢাকা মেডিকেল কলেজের ইন্টার্নি হোস্টেলে, আমার বন্ধু সিয়ামের ঘরে। তখনো শেষ সিগারেট ধরাইনি, বিনয় মজুমদারের *ফিরে এসো চাকা* বইটা দুই হাতে ধরে, বুকের নিচে বালিশ আর কোমর পর্যন্ত কাঁথা রেখে আমি বিড়বিড় করে পড়ে যাচ্ছিলাম: *আমি মুগ্ধ; উড়ে গেছ : ফিরে এসো, ফিরে এসো, চাকা,/রথ হয়ে, জয় হয়ে, চিরন্তন কাব্য হয়ে এসো।/আমরা বিশুদ্ধ দেশে গান হবো, প্রেম হবো, অবয়বহীন/সুর হয়ে লিপ্ত হবো পৃথিবীর সকল আকাশে।* ঢাকা শহরে শীতকালেও খুব শীত পড়ে না, ব্যতিক্রমী একটা-দুটো সপ্তাহ ছাড়া; মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে, ইতস্তত, সশব্দ; টিউবলাইটের কাছে ঘুরঘুর করছে পোকা, আর রাত্রির ভোজের খোঁজে গ্রীবা বাড়িয়ে আছে দেয়ালবিহারী এই ঘরের পোষমানা টিকটিকিটা।

এমন সময় ফোন বেজে ওঠে—মোবাইল ফোন।

হ্যাঁ, মোবাইল ফোন! তুমি কেড়ে নিচ্ছ আমাদের সকল ব্যক্তিগততা, আমাদের একান্ততা, অবসর—কবিতার, ভাবনার, ঘুমোবার...

আমি মোবাইলটা তুলে নিই, নম্বর দেখি। অচেনা সংখ্যা, অচেনা কল, তবু সবুজ বোতামে বুড়ো আঙুল চলে যায় স্বয়ংক্রিয়, মিস্ কল মিসেস হয়ে যায়; কলের কুমারীত্ব হরণ করি বৃদ্ধাঙ্গুলির সামান্য চাপে।

হ্যালো, আমি বিনয় মজুমদার পড়ার আমেজ কণ্ঠে ধারণ করে বলি, হ্যালো!

মধ্যরাতে নির্জন ঘরে সেই স্বর সমুদ্রের ওপার থেকে আসা বলে শোনায় আমার নিজেরই কানে।

হ্যালো, মিঠু সাহেব বলছেন?

হ্যাঁ।

আপনার ভাগ্নী রঞ্জু খুব বিপদে পড়ছে। কয়েকজন গুণ্ডা তারে দাবড়ানি দিছে। উনি দৌড়াইয়া আমার ট্যাক্সিতে উইঠা পড়ছে।

রঞ্জু? নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার শরীরে বিদ্যুৎ খেলে যায়।

সে ছিল বিদ্যুৎসঞ্চারী। স্পর্শবিহীন সে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট করতে পারত মানুষকে। আমাকে অন্তত।

রঞ্জনার বিপদ! আমি কাঁপতে থাকি, আমার বিশীর্ণ শরীরখানা তারে ঝোলানো ঘুড়ির লেজের মতো কাঁপে।

আপনি কে বলছেন?

আমি ট্যাক্সি চালাই, স্যার।

রঞ্জু কোথায়?

আছে। কথা কন।

আমি মুঠোফোন কানে ধরে রঞ্জুর মধুস্বর শোনার জন্য অপেক্ষা করি, তখন তক্ষকের ডাকের বদলে আমারই হৃদধ্বনি ঘড়ির কাঁটার মতো বাজতে থাকে।

মামা। রঞ্জনার শ্বাসে ভরা স্বর, ও কি হাঁপাচ্ছে!

বলো রঞ্জু, কী? আমি আবৃত্তিচর্চিত কণ্ঠে উৎকণ্ঠা ফুটিয়ে বলি।

মামা, আমাকে বাঁচান।

তুমি এখন কোথায়?

সায়েন্স ল্যাবরেটরির মোড়ে।

কী হয়েছে?

আপনি আসেন। আমি সব বলতেছি।

আচ্ছা, তুমি থাকো। আমি আসছি।

তাড়াতাড়ি আসেন।

আচ্ছা, তাড়াতাড়িই আসছি।

রঞ্জনা আমার ভাগ্নি নয়। আমিও তার মামা নই। ও রন্টুর ছোট বোন। রন্টুর সঙ্গে আমার পরিচয় টিএসসিতে, জাতীয় কবিতা উৎসবের অফিসে। রন্টু এসেছিল আমার ভাগ্নে সাগরের সঙ্গে। রন্টু কবিতা লেখে। উৎসবে অংশ নিতে চায়। সাগর আমাকে মামা ডাকল, রন্টুও তা-ই। রন্টুর বোন রঞ্জুও যে আমাকে মামা ডাকবে, তা কাম্য না হলেও অস্বাভাবিক নয়।

রঞ্জু, রঞ্জনা, সুরঞ্জনা, সু...বিপদে পড়েছে। এত রাতে? গুণ্ডারা তাকে ধাওয়া করেছিল! আর সে দৌড়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠে পড়েছে! এখন সে অপেক্ষা করছে উদ্ধারের আশায়, সায়েন্স ল্যাবরেটরির মোড়ে। ঠিক কোন জায়গাটায়?

নিশ্চয়ই পুলিশ বক্সের সামনে।

পুলিশ বক্সের সামনে হলে হয়তো বিপদটা কম! হয়তো গুণ্ডারা আরেকটা গাড়ি কিংবা মোটরবাইক নিয়ে ধাওয়া করে এলেও পুলিশ বক্সের সামনে খুব সুবিধা করতে পারবে না।

আমি যাব। আমি তো যাবই।

আমার পা দুটো যন্ত্রচালিতের মতো ট্রাউজারের মধ্যে ঢুকে যায়, স্যান্ডেলের গহ্বর খুঁজে নেয় পদতল, শার্ট বদলানোর সময় নেই, চুল আঁচড়ানোর দরকার নেই, কিছুক্ষণের মধ্যে দরজায় তালা ঝুলিয়ে আমি ইন্টার্নি হোস্টেলের সামনে এসে দাঁড়াই। ততক্ষণে মোবাইল ফোন চলে গেছে কানে, সিয়ামের নম্বরে কল করা হয়ে গেছে, রিং বাজছে। সিয়াম কি এখন ওয়ার্ডে কোনো রোগীর নাড়ি ধরে দাঁড়িয়ে আছে, চোখ তার কবজির ঘড়িতে, নাকি ডিউটি ডাক্তারদের কক্ষে কয়েল জ্বালিয়ে সে এলিয়ে পড়ে আছে টেবিলের ওপর, থুতনি কাঠের গায়ে, লালা ঝরছে গাল বেয়ে...

হ্যাঁ, মিঠু। সিয়ামের নিদ্রাজনিত কণ্ঠ ভেসে আসে মোবাইল ফোনে।

দোস্ত, শোন, একটা বিপদ হইছে, তুই তো রঞ্জনাকে চিনিস...

রঞ্জনা...

চিনিস না, ওই যে রন্টুর বোন, রঞ্জনা!

হ্যাঁ, কী হইছে? এত রাতে?

ওকে নাকি গুণ্ডারা ধাওয়া করেছিল, ও এখন সায়েন্স ল্যাবরেটরির পুলিশ বক্সের সামনে।

তুই জানলি কী করে?

আমাকে ফোন দিয়েছিল একটা ট্যাক্সিওয়ালা।

তুই যাচ্ছিস নাকি?

যাব না! কী বলিস!

যদি কোনো ছিনতাইকারীর পাতা ফাঁদ হয়!

হলে হবে। তা হলেও তো আমাকে যেতে হবে। মেয়েটা বিপদে পড়েছে।

যাবি? যা।

তুইও চল।

না, আমার তো এমার্জেন্সিতে ডিউটি।

আচ্ছা, তাহলে আমি গেলাম।

শোন। কোনো বিপদ-টিপদ হলে ফোন দিস।

তোকে ফোন দিব কেন? তোর তো শালা এমার্জেন্সি ডিউটি। তুই ঘুমা। শোন, লালা ফেলে তো টেবিল ভিজায়া ফেলছিস, টিসু দিয়া মোছ। গাধা...

ততক্ষণে সামনে একটা রিকশা পেয়ে গেছি। এই রিকশা, যাবা...

না স্যার।

কেন যাবা না, কেন?

জমা দিতে যাইতেছি স্যার। কোন দিকে যাইবেন?

সায়েন্স ল্যাবরেটরি...

না স্যার।

মুশকিল তো! রিকশা কি একটা বেবিট্যাক্সি কি একটা ট্যাক্সি কি পাওয়া যাবে না...

বদরুন্নেসা কলেজের উল্টো দিকে শীতের মধ্যরাতে ফুটপাত ধরে দ্রুত হাঁটছি গন্তব্যের দিকে।

দূরে বুয়েটের মাঠের ধারের গাছগুলোর ওপর রাস্তার আলো ঘিরে কুয়াশা, রাজপথ শাসন করছে কয়েকটা নেড়ি কুকুর, রিকশাভ্যান বোঝাই করে যাচ্ছে কাঁদি কাঁদি সাগরকলা, সম্ভবত পরের দিন রোগী কিংবা তাদের সঙ্গীদের প্রাতরাশ হবে বলে, কিন্তু আমি তো কোনো যানবাহন পাচ্ছি না।

ভাগ্য অতি সুপ্রসন্ন বলে মনে হয়।

একটা মাথাবাতি কুয়াশা ভেদ করে এদিকেই আসছে। তার মানে, ওটা একটা মোটরবাইক। কাছে এলে সোডিয়াম বাতির আলোয় দেখতে পাই লেখা 'সংবাদপত্র'। আমাকে বিস্মিত করে বাইকটা আমারই পাশে দাঁড়ায়, হেলমেটের ভেতর ঢাকা মুখখানি থেকে আওয়াজ ভেসে আসে মোটরবাইকের ভটভট শব্দ ছাপিয়ে, মিঠু ভাই, কই যান?

আরে, এ তো বাবু! শামসুজ্জামান বাবু। দৈনিক পত্রিকার ফটোসাংবাদিক! বাবু হেলমেট খুলে হাতে নেয়।

আমি বলি, একটা বিপদ হয়েছে। আমার একটা ভাগ্নি কী ছিনতাইকারীর কবলে পড়েছে। সায়েন্স ল্যাবরেটরি পুলিশ বক্সে আছে। চলো তো, একটু যাই।

চলেন চলেন। সম্ভবত খবরের গন্ধ পেয়ে বাবু হেলমেট আবার মাথায় পরে নেয়।

আমি তার বাইকের পেছনে উঠে পড়ি।

তার পরনের চামড়ার জ্যাকেট আমার পেটে খসখসে একটা অনুভূতি সৃষ্টি করে। কিন্তু ধাবমান মোটরবাইকের পেছনের আসনে বসে থেকে আমি বুঝি, বাতাসটা ঠান্ডা। চোখ-কান গরম হয়ে ছিল, দুই কানে শীত-বাতাসের ঝাপটা আমার কাছে বোনের নরম হাতের স্পর্শের মতো লাগে।

সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে পুলিশ বক্সের সামনে নয়, তাদের দেখা মেলে ল্যাবএইড হাসপাতালের সামনে। একটা হলুদ ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।

আমি বলি, বাবু, ওই যে ওইখানে মনে হয়।

বাবু বাইকের একসিলারেটর চাপ দিলে রাতের নীরবতার গায়ে শব্দের একটা বড় আঁচড় আঁকা হয়।

আর আমরা দ্রুতই সড়কবিভাজক পেরিয়ে উল্টোপাশ দিয়ে ওই ট্যাক্সিটার কাছে পৌঁছাই। ট্যাক্সিওয়ালা মধ্যবয়সী, গলায় মাফলার; প্যান্ট আর জ্যাকেট পরা, নাকের নিচে গোঁফ, গাড়ির গায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

মোটরবাইক থামতে না থামতেই আমি নামি। ট্যাক্সিওয়ালাকে কী বলব...

রঞ্জনা নেমে আসে। কামিজ-সালোয়ার পরা, খানিকটা উদ্‌ভ্রান্ত, চুল এলোমেলো, সোডিয়াম আলোয় তার গায়ের রং দেখাচ্ছে শুকনো পাতার মতো, তবু তাকে সুন্দর লাগছে। সুন্দর যখন অনায়াস আয়েশে থাকে, তখনো সুন্দর; যখন এলোমেলো বিপন্ন, তখনো সুন্দর...

মামা। সে মুখ খোলে...

কী হয়েছে? আমি গলা মোটা করে বলি।

ট্যাক্সিওয়ালা মুখ খোলে, আরে জানেন না, কতগুলা গুণ্ডা হ্যারে দাবড়ানি দিছে, হে দৌড়াইতেছে, আর পিছনে পিছনে গুণ্ডাগুলান ধর ধর বইলা ছুইটা আইতাছে। আমি না থাকলে কী যে হইত...

কে দৌড়ানি দিছে? শামসুজ্জামান বাবু তার সাংবাদিক-অনুসন্ধিৎসু কণ্ঠ ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করে।

রঞ্জনা বলে, মামা, আমাকে আপনি আপনার ওইখানে নিয়া চলেন। তারপর আমি সব বলতেছি।

আমার ওখানে? আমি থাকি ইন্টার্নি হোস্টেলে। ওইখানে তো তোমাকে নিয়ে যেতে পারব না। চলো, তোমাকে রন্টুর ওখানে দিয়ে আসি। রন্টু কই? ওকে ফোন করো। আমি কপালে চিন্তারেখা ফুটিয়ে বলি।

আপনাকে সব বলতেছি মামা। আমাকে আগে আপনার ওখানে নেন। রঞ্জনার কণ্ঠে আকুলতা!

কেন, রন্টুর ওখানে চলো। আমি বিকল্প বাতলাই।

না। ভাইয়ার ওখানে নিলে আমি আত্মহত্যা করব।

কেন?

ভাইয়া আমাকে নাগেশ্বরী পাঠায়া দেওয়ার জন্য বাসে তুলে দিছে।

যাও নাগেশ্বরী।

না, আমি নাগেশ্বরী যাব না। আপনি আমাকে নিয়া যান।

রন্টু কী মনে করবে, বলো?

ভাইয়া কিছু মনে করবে না। মামা, আপনি যদি আমাকে না নিয়া যান, আমি কিন্তু আত্মহত্যা করব। আর আমি যা বলি, তা করতে পারি। আপনি জানেন।

এত সুন্দর একটা মেয়ে আত্মহত্যা করবে! পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো এত্ত রূপ নিয়ে চলে যাবে দূরে! আর আমি *হায় চিল, সোনালি ডানার চিল* বলে কাব্যি করব! *কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে পারে* বলে হা-হুতাশ করব!

এই সুন্দরীতমাকে অবশ্যই বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

আচ্ছা, দেখি আমি, কী করা যায়! মোবাইলে সাদির নম্বর খুঁজতে খুঁজতে আমি বলি।

সাদি থাকে ভূতের গলিতে, আর্ট কলেজে অনন্তকাল ধরে পড়তে থাকা

আমাদের বন্ধু সাদি। ও আর ওর বড় বোন থাকে ওই বাসায়, দুলাভাই কুয়েতে, ওর বাসাতে যদি ঠাঁই হয় সুরঞ্জনার।

সাদি ফোন ধরে না। আশ্চর্য! বাজছে কিন্তু ফোন ধরছে না কেন গাধাটা!

আমি বলি, বাবু, সাদির ওখানে রাখা যায়। কিন্তু সাদি হারামজাদা তো ফোন ধরছে না।

বাবু বলে, তা হলেও চলেন, ওই বাসাতেই যাই। গিয়া দরজা ধাক্কাই।

চলো।

ট্যাক্সিওয়ালাকে বলি, আপনার ভাড়া আমি দিয়ে দেব। চলেন, একটু ভূতের গলিতে।

ভূতের গলিতে যদি সুরঞ্জনা ওঠে, তাহলে এর নাম আমি চিরকালের জন্য পাল্টে দেব, এর নতুন নাম দেব সুরঞ্জনা সড়ক, নাকি সুন্দরীতমা সরণি!

বাবু বলে, মিঠু ভাই, আপনি ট্যাক্সিতে ওঠেন। আমি ট্যাক্সির পিছন পিছন আসতেছি।

তা-ই হোক। আমি সুরঞ্জনার ডান পাশে বসে পড়ি। আমার বাঁ পাশে সুন্দরীতমা, কিন্তু তার সৌন্দর্যের মধ্যে এমন একটা নিষ্কলুষতা আছে, যেন তা স্পর্শমাত্র ভেঙে পড়বে। সে আমার এত কাছে, এত কাছে যে আমি তার দিকে তাকাতে পারছি না, কিন্তু আমার মধ্যে এক ধরনের ভালো-লাগা কাজ করতে থাকে যে আমি আর সে একই গাড়ির ভেতরের একই বাতাসটুকু গ্রহণ করছি, আমরা দুজন এক গাড়িতে আছি, সেই আমারই একটিমাত্র সুখ, তার গায়ের সুবাসভরা বায়ে নিঃশ্বাস নিয়ে আমার ভরে বুক।

ট্যাক্সি স্টার্ট নিতে সমস্যা করে। তবে শেষতক সে সমস্যারও সমাধান হয়। গাড়ি চলে।

ডান পাশে অ্যারোপ্লেন মসজিদ পেরিয়ে বাটার সিগন্যালের লাল সংকেতকে অগ্রাহ্য করে হাতিরপুলের পুলবিহীন মোড় হয়ে আমরা ভূতের গলি নামক রহস্যহীন মানববসতির ভেতরে একটা তিনতলা বাড়ির বন্ধ লোহার ফটকের সামনে এসে দাঁড়াই। সাদিরা থাকে দোতলায়। গেটের কাছেই তিনটা দোরঘণ্টি। কোনটা কোন তলার বেল, সেটা বোঝার জন্য আমি মোবাইল ফোনের আলো জ্বালিয়ে বেলের পাশে লেখা অক্ষরগুলোর পাঠোদ্ধার করি।

বেল বাজে।

আর সঙ্গে সঙ্গে আমি কল করি সাদির নম্বরে।

রিং বাজে, সাদি ফোন ধরে না, বহুক্ষণ পর মোবাইল ধরে সাদি।

তার কণ্ঠে ঘুম আর বিরক্তি, হ্যালো।

সাদি, আমি মিঠু। তোদের বাসার সামনে। একটু দরজাটা খোল তো।

এত রাতে! কী হইছে?

তেমন কিছু না...

আচ্ছা, আমি আসতেছি, সাদি বলে।

হারামজাদা আসতে সময় নেয়, আমি ট্যাক্সির দরজা খুলে সুরঞ্জনার দিকে তাকাই। পাশের বারান্দা থেকে আসা আলোর একটা টুকরা তার পায়ের কাছে বেড়ালের মতো আশ্রয় গোঁজে।

এই, কী রে? সাদির গলা, শোবার পোশাক-পরা সাদি দোতলার বারান্দার রেলিং ধরে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছে।

নিচে আয় সাদি, চোর-ডাকাত কিছু না। আয়।

সাদি নিচে আসে, তালা খোলার শব্দ হয়। কী ব্যাপার?

আমি বলি, সুরঞ্জনাকে আজকে রাতে তোদের বাসায় রাখতে হবে।

সাদি খনখনিয়ে বলে, কোন সুরঞ্জনা?

আমি বলি, রন্টুর বোন।

মাথা খারাপ! এখানে কোথায় রাখব?

তোরা যেখানে থাকিস—বাসায়!

আপা আছে। আপার শ্বশুরবাড়ির মেহমানরা এসে উঠছে এখানে। এর মধ্যে ঝামেলা করা যাবে না।

আমি বলি, মেয়েটা বিপদে পড়ে এসেছে। আজকের রাতটা ড্রয়িংরুমেই থাকতে পারবে। কাল সকালে চলে যাবে।

না দোস্ত, তোরা অন্য কোথাও দ্যাখ।

এত রাতে অন্য কোথায় যাব!

দেয়ার আর মেনি হোটেল্স অ্যান্ড মোটেল্স অ্যান্ড ক্লিনিক্স ইন দিস সিটি। যেকোনোখানে যা। বলে সাদি গেট বন্ধ করে দেয়।

যা-শ্-শালা! আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল, সাদি শালা একটা হারামজাদার হারামজাদা।

বাবু, কী করা যায় বলো তো!

মিঠু ভাই, চলেন, ইন্টার্নি হোস্টেলেই যাই।

না রে, সিয়ামকে বিপদে ফেলা হবে। এমনিতেই আমরা থাকি অবৈধভাবে।

এই সময় আমার মোবাইল ফোন বেজে ওঠে। রন্টু ফোন করেছে। হ্যালো রন্টু। আমি বলি।

মিঠু মামা, রঞ্জু কি আপনার ওখানে? রন্টু চিৎকার করে প্রশ্ন ছুড়ে দেয়।

না তো! কেন? আমি নির্বিকার ভঙ্গিতে মিথ্যা কথা বলি।

আপনি কোথায়?

আমি তো ইন্টার্নি হোস্টেলেই থাকি।

এত রাতে আপনি জেগে আছেন কেন? তার মানে, রঞ্জু আপনার কাছে।

বিরক্ত কোরো না তো রন্টু! রাখো। ঘুমাতে দাও। আমি ফোনের লাইন কেটে দিই।

তারপর বলি, চলো, আমরা ট্যাক্সিতেই রাতটা কাটিয়ে দিই। বাবু, তুমি যাও। রুমে গিয়ে ঘুমাও। আমি আর রঞ্জু ট্যাক্সিতেই রাতটা পার করব। এতক্ষণে তো আড়াইটা প্রায় বেজে গেছে। আর পাঁচটা ঘণ্টা।

বাবু বলে, মিঠু ভাই, এদিকে আসেন। সে আমাকে খানিকটা আড়ালে নিয়ে যায়। প্রকৃত হিতৈষীর মতো করে সে বলে, মিঠু ভাই, আমি কিন্তু ঝামেলার গন্ধ পাইতেছি। সাংবাদিক মানুষ তো। আগাম টের পাই। আপনি ওকে ট্যাক্সিতে তুইলা ওর ভাইয়ের কাছেই রেখে আসেন।

আচ্ছা, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ। তুমি তাহলে যাও।

চলেন, রন্টুর বাসা পর্যন্ত গিয়া ওরে নামায়া দিয়া আপনারে নিয়া আসি। এত রাতে আপনি আসবেন কেমন করে একা!

ট্যাক্সিওয়ালাটা ভালো আছে। আমি এটাতেই ফিরতে পারব বাবু। থ্যাংক ইউ। তুমি যাও। আমি বাবুকে ফেরার পথ দেখিয়ে দেওয়ার ভঙ্গি করি।

আচ্ছা, আমি আসি, বলে বাবু মোটরবাইকে স্টার্ট দিয়ে চলে যায়। তার ভটভট আওয়াজ মিলিয়ে যায় ধীরে ধীরে। তখন পুরো পাড়া আবার দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে পড়ে।

আধেক লীন হৃদয়টি আমাকে ডাকে সুদূরে। আমি ড্রাইভারকে বলি, আগামীকাল সকাল সাতটা পর্যন্ত আমরা আপনার ক্যাবে ঘুমাব। আপনি কোনো একটা নিরাপদ জায়গা দেখে আমাদের নিয়ে গিয়ে সেইখানে গাড়ি পার্ক করে রাখেন। আর আপনার ভাড়া যত আসে, আমি সব দিব।

১৪০০ টাকা দিতে হইব। ট্যাক্সি ড্রাইভার খানিকক্ষণ আপন-মনে কী যেন হিসাব করে আমাকে বলে।

আমি বলি, এ তো এসিওয়ালা ফাইভ স্টার হোটেলের ভাড়া চাইলেন।

আচ্ছা, কমিয়ে নিয়েন খানিকটা। এখন চলেন।

আমি ট্যাক্সিতে উঠলে সুন্দরীতমা আমার কাঁধে মাথা রাখে; আমার সমস্ত অস্তিত্বকে চিরদিনের জন্য ও যেন ধন্য করে দেয়।

ট্যাক্সি চলছে, আমার কাঁধে সুরঞ্জনার মাথা; ট্যাক্সি চলছে, আমার গায়ের সঙ্গে অপার্থিব সৌন্দর্যসম্ভার; ট্যাক্সি চলছে, পুরোটা ট্যাক্সি যেন স্বর্গীয় রথ। বাইরে অন্ধকার, বাইরে সিটি করপোরেশনের সাধ্যমতো আলো, ভেতরে জ্যোৎস্না...

আমার ভয় হতে থাকে—যদি হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়, তাহলে তক্ষুনি এই মেয়ে বলে বসবে, এই রোকো, গাড়িটা থামাও, আমি নেমে যাব; অথবা সারাক্ষণই গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের 'নিদ্রিতা সুন্দরী ও উড়োজাহাজ' গল্পের মতো সে ঘুমিয়ে থাকবে, আর ঘুম ভাঙলেই সে নেমে যাবে একটিও কথা না বলে...

ড্রাইভার বলে, স্যার, কোন দিকে যাব?

যেদিকে তোমার সুবিধা হয়। তাকে না জাগানোর জন্য গলা খাদে নামিয়ে আমি বলি।

ড্রাইভার কোন দিকে যায়, আমি জানি না। বাইরে তাকাবে কোন মূর্খ, যখন জগৎ তোমারই সমীপে!

ফোন বেজে ওঠে মোবাইলে। আহ্, কী যন্ত্রণা! এই মোবাইল ফোন জিনিসটা যদি ভেঙে ফেলা যেত! বলে হাতড়াই প্যান্টের পকেটে। বসে থেকে, কাঁধে ভর দিয়ে ঘুমিয়ে পড়া পার্শ্ববর্তিনীকে না জাগিয়ে প্যান্টের পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করা যে তারের ওপর দিয়ে হাঁটার চেয়েও কঠিন, আপনারা কি তা জানেন! আমি সেদিন সেই অসাধ্য সাধন করি।

ফোন করেছে রন্টু, আবারও।

আমি ফোন ধরে বলি, হ্যাঁ রন্টু, কী? এত রাতে বারবার?

মামা, রঞ্জু আপনার কাছে?

কী বারবার এক কথা বলছ! রঞ্জু কেন আমার কাছে থাকবে!

আপনি কথা বলেন।

কার সাথে?

বলেন, পুলিশের বড় অফিসার। আমার ফুপা হয়।

আমি কেন তাঁর সাথে কথা বলব?

এই যে মিঠু সাহেব, শোনেন, আমার নাম আবদুল মালেক। আপনি

রঞ্জুকে নিয়া যদি কবরের নিচে ঢোকেন, সেইখান থেকে আমি আপনাদের বার করে আনব। রঞ্জু কোথায়, বলেন।

আমি বলি, মালেক সাহেব, আপনার গলা মোটা করে কথা বলার দরকার হলে আপনি জায়গামতো করেন। এটা ভুল জায়গা। বলেই আমি দিই লাল বোতাম টিপে। মোবাইলের গলাটা একটু জোরেই টিপে ধরা হলে তার দম বন্ধ হয়ে যায়, সে অসাড় হয়ে পড়ে নিয়মমাফিক।

ট্যাক্সি একটা জায়গায় এসে দাঁড়ায়।

এটা কোন জায়গা!

মেডিকেলের সামনে, স্যার। এইখানে কেউ সন্দেহ করব না।

আমি যে ইন্টার্নি হোস্টেলে থাকি, রন্টু সেটা জানে। রাতের বেলাই কি পুলিশ নিয়ে ঘেরাও দেবে নাকি ওই সাদা তিনতলা ভবনটা!

দিলে দেবে। মরুক-গে। আমরা এখন এইখানে বসে থাকি, হলুদ ক্যাবে, দুজনে পাশাপাশি, ভবিতব্যহীন।

ট্যাক্সিচালক ঘুমিয়ে পড়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই। তার নাকডাকার শব্দ আসে।

সহযাত্রিণীও ঘুমে কাদা।

শুধু আমার ঘুম আসছে না।

উত্তেজনায় এতক্ষণ টের পাইনি, শেষরাতের বাতাসে শীতের কোপ। আস্তে আস্তে ঠান্ডা লাগতে শুরু করে। আশ্চর্য, রঞ্জনা একটামাত্র সাদা-কালো ছাপা কামিজে ও সালোয়ারে কিসের আশ্বাসে উষ্ণ হয়ে আছে! কিসের ভরসায় সে এতটা নিশ্চিত!

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ট্যাক্সিচালকের ডাকে ঘুম ভেঙে গেলে নিজেকে আবিষ্কার করি তার কোলে। আর সে আমার মুখটার দিকে রহস্যময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। শত বছরের পুণ্যে এ রকম একটা সুযোগ এল আমার জীবনে।

পৃথিবীর সবচেয়ে রূপবতীটির কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে নিলাম।

চারদিকে আলো। শীতের সকালের আলো এত প্রকট হতে পারে! চোখ খুলে রাখা দায়। মাথাও ব্যথা করছে।

স্যার, এখন কই যাইবেন?

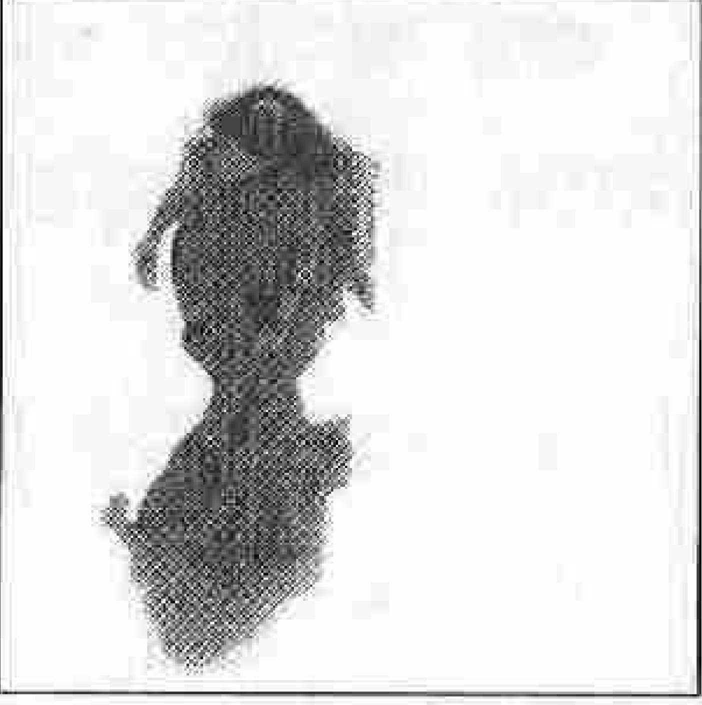
এটা তো একটা দারুণ প্রশ্ন করল ট্যাক্সিওয়ালা। অত্যন্ত সময়োচিত আর বাস্তব প্রশ্ন। এখন কোথায় যাব?

কোথায় যাওয়া যায়? কোথায় যাওয়া সম্ভব? আর কোথায় যাওয়াই বা

সংগত!

ঠিক তখনই ঘুম ভেঙে যায় সুন্দরীতমার, আর সে আমাকে তার দুই হাতের বেড়িতে কাছে টেনে নেয়, আমার কানে মুখ ঘষে, আর আমাকে খুব আলতো আদরে নাজুক করে দিয়ে বলে, মিঠু সোনা, আমাকে তুমি তাড়ায়া দিয়ো না, আমি তোমার কাছে থাকতে চাই। চিরজীবন!

বলেন, এরপর আর কোনো কথা চলে!



রঞ্জুকে আমি প্রথম দেখি নাগেশ্বরীতে।

নাগেশ্বরী, সে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে যেতে যেতে যেতে... মোটামুটিভাবে সৃষ্টির অন্য পারে অবস্থিত একটা জায়গা, থানা সদরই বটে! ঢাকা থেকে কুড়িগ্রাম পৌঁছাতেই লেগে যায় সারা রাত, নৈশযানে। আর নাগেশ্বরী? তারও পরে। তখনো ধরলা নদীতে সেতু হয়নি, আমি যখন প্রথম যাই। ভোরবেলা, সেও এক কুয়াশামাখা ভোর ছিল; আর ধরলা নদীটি, আব্বাসউদ্দীনের গানে পাওয়া সেই বিখ্যাত নদীটি তখনো কুয়াশার কাঁথা মুড়ে ছিল ঘুমিয়ে।

আমরা নদী পার হই নৌযানে; এমন সন্তর্পণে, যেন নদীটির ঘুম না ভাঙে। কিন্তু ইঞ্জিনের শব্দ আর প্রপেলারের আঘাতে নদীটার ঘুম ভেঙে গেলে সে পাশ ফিরে শোয়, আর লাল আলোয়ান পরা সাইকেলযাত্রী, তিনজন কর্মসন্ধানী নারীসমেত আমরা পেরিয়ে যাই ঐতিহাসিক ধরলা।

আমাদের গাইড রন্টু। কবিতা লেখে, আবৃত্তি করে; আমি যার মামা বলে এরই মধ্যে খ্যাতিমান। আমাদের সঙ্গে আরও আছেন গণসংগীতশিল্পী মাহমুদুজ্জামান বাবু।

নদীতে ভাসতে ভাসতে আমি বলি, বাবু ভাই, এই রকম নদী দেখেই কিন্তু ওপার বাংলার প্রতুল মুখোপাধ্যায় এই গানটা লিখেছিলেন, *আমি এই বাংলার মায়াভরা পথে হেঁটেছি অনেক দূর...আমি একবার দেখি বারবার দেখি, দেখি, বাংলার মুখ।*

বাংলার মুখ, রূপসী বাংলার মুখ, আহা! সকালবেলার বাসি মুখে-চোখে পিচুটি নিয়ে কুয়াশাভরা বাংলার মুখ দেখি বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে, আর ভাবি : *আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে—এই বাংলায়।*

নাগেশ্বরী একটা ছোট্ট কিশোরীর মতো নতমুখ থানা শহর। সীমান্তের

কাছে। তার কলা-কাঁঠাল-আমগাছের ওপর মাথা বাড়িয়ে আছে স্লিম সুপুরিগাছ, যেমন থাকে; আর তারও ফাঁকে ফাঁকে ঢেউটিনে ছাওয়া বাড়িগুলোর ছাদে ছাদে এখনো অ্যান্টেনা দেখা যায়! অর্থাৎ এই শহরে ডিশ অ্যান্টেনাও এসে গেছে!

রন্টুর বাবা একজন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বটে, কিন্তু তিনি সপরিবারে থাকেন এই থানা শহরে। ঢেউটিনের চাল, পাঁচ ইঞ্চি ইটের দেয়াল, ঘরের ভেতরে ঘন সবুজ রং, লাল রঙের শানের মেঝে। বাড়িটা চমৎকার! কলতলা থেকে নলকূপের হাতল চাপবার শব্দ আসছে।

আমাদেরও যেতে হলো কলতলাতে, হাত-মুখ ধোয়ার জন্য।

আমার মুখভর্তি টুথপেস্ট, কাঁঠালতলার নিচে এই টিউবওয়েলের পাড়, আর লাল রঙের পাতা ঝরে পড়ে আছে এই জায়গাটা জুড়ে; একটা-দুটো মুরগি দ্রুত দৌড়ে যাচ্ছে আমাদের অচেনা জেনে, তখনই আমি একটা হলুদ তোয়ালে হাতে দেখতে পাই রঞ্জুকে।

আমার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হওয়ার জোগাড়।

মানুষ এত সুন্দরও হতে পারে! এত সুন্দর! এত সুন্দর!

তখনই, ওই পেস্টভরা মুখ নিয়েই, আমার মন পড়তে থাকে :

প্রিয়তমা, সুন্দরীতমা রে,
যে আমার উজ্জ্বল উদ্ধার...

কিন্তু আমাকে গম্ভীর আর অবিচল থাকতে হয়। কারণ সে রন্টুর বোন, আর আমি রন্টুর মামা। সে সূত্রে এই মেয়েটিরও মামা আমি।

মাহমুদুজ্জামান বাবু স্মার্ট লোক, তিনি মেয়েটির সঙ্গে আলাপ জুড়ে দেন, বাহ্ বা, টাওয়েল হাতে দাঁড়িয়ে আছে, মেয়েটি কে?

(একটা থাপড়ে বাবুর দাড়িগুলো সব যদি উপড়ে ফেলা যেত। থাপড়ে সেটা সম্ভব নয়, খামচি দিতে হবে। সেটাও সম্ভব নয়, ভদ্রলোক ব্যথা পাবেন। তার চেয়ে যখন ঘুমুবেন লোকটা, তখন একবার-ব্যবহার্য একটা রেজর দিয়ে ওঁর দাড়িটা কামিয়ে দিতে হবে)

মেয়েটি হাসে। একেই বোধহয় বলা যায়, অমলিন দাঁতের পঙ্‌ক্তির হাসি।

সেদিন সুরঞ্জনা পরেছিল ঘিয়ে রঙের একটা জামা, আর তারই প্রতিফলন পড়েছিল ওর ত্বকে, কপালে, নাকে, গালে। ওকে যে কী পবিত্র, কী স্নিগ্ধ, কী উজ্জ্বল লাগছিল!

তোমার নাম কী?

রঞ্জু।

বাবু বলেন, ভালো নাম নাই?

রঞ্জু বাবুকে তোয়ালে এগিয়ে দিতে দিতে বলে, সুরঞ্জনা চৌধুরী।

মাহমুদুজ্জামান বাবু দাড়ি মুছতে মুছতে—তাঁকে দেখাচ্ছে ভয়ঙ্কর এক আগ্রাসীর মতো—বলেন, জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল কোথায়? কলকাতায়, নাকি বরিশালে?

হালায় কী রকম মেয়ে-পটাইন্যা, ভাবেন!

আমরা নাগেশ্বরী এসেছি এখানকার উদয়ন তরুণ সংঘের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠান করতে।

সকালের নাশতা—পরাটা, আলু চিকন চিকন করে ভাজা আর ডিমের অমলেট, খাঁটি গরুর দুধের চা (এলাচ দেওয়া, খুবই সুস্বাদু, মনে হয় রঞ্জু নিজেই বানিয়েছে; রঞ্জু যে চা বানাবে, তাতে চিনি দেওয়ার দরকার পড়বে না) ভ্রমণ-ক্লান্তিজনিত ক্ষুধা নিয়ে আমরা গোগ্রাসে গিলি। তারপর আসেন পরিতোষ চক্রবর্তী।

তাঁর গায়ের রং ধবধবে সাদা, মাথায় টাক, ছোটখাটো মানুষ, কিন্তু সাংগঠনিক ক্ষমতায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তাঁর নিরলস প্রচেষ্টায় এই এলাকার সাংস্কৃতিক কার্যক্রম এখনো অব্যাহত আছে; ছোট্ট থানা শহরটিতে এখনো বসে কবিতাপাঠের আসর, হয় আবৃত্তি-উৎসব আর নাট্যমেলা।

আমরা তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি শহর দেখতে।

কিন্তু আমার মন পড়ে থাকে ওই টিনে ছাওয়া বাসাটাতেই, যার নাম চৌধুরী ভিলা, যেখানে কাঁঠালগাছতলায় ঝরে পড়ে আছে লালচে পাতা, তার ওপর স্পঞ্জের স্যান্ডেল পরা এক জোড়া পা।

বাংলাদেশের সব থানা শহর দেখতে একই রকম। টিনের দোকানপাট, মনোহারি দোকান, চালের আড়ত, পান-সিগারেটের জমজমাট খুপরি, কালো কালো বেঞ্চে সাজানো চা-মিষ্টির দোকান, দোকানের বাইরে জ্বলন্ত চুলার ওপর কড়াইয়ে মোটা মোটা পোড়-খাওয়া পরাটা...রাস্তায় শুধু সাইকেল আর সাইকেল, রিকশাভ্যান আর দ্রুত ছুটে-চলা মাতব্বরি মোটরবাইক।

দেয়ালে পোস্টারের ওপর পোস্টার, বেশির ভাগই সিনেমার, কখনো কখনো ভোগ্যপণ্যের, সাবানের, শ্যাম্পুর; পেপসির বোতল ধরে রাখা কারিনা কাপুর-মার্কা সাইনবোর্ডের নিচে পোড়-খাওয়া মানুষের ভিড়...

আমরা তরুণ সংঘের ঘরে যাই। টিনের ছাপরা, বেড়ার ঘর। মেঝেতে

ইট। আলমারিতে বই। কতগুলো শিল্ড আর কাপ।

মেঝেতে পাতা শীতলপাটির ওপর হারমোনিয়াম আর তবলা-ডুগি।

বিকেলে অনুষ্ঠান ছিল।

প্রথমে কবিতাপাঠ।

আমি আমার নিজের লেখা কবিতা পড়ি।

দর্শকসারি তখন ফাঁকা।

এ রকম পরিস্থিতিতে আমার কবিতা পড়ার মানেই হয় না। কিন্তু আমি খুব মন দিয়ে খুব আবেগের সঙ্গে পড়ি, কারণ দর্শকসারিতে শাড়ি পরে বসে আছে সুন্দরীতমা।

মাহমুদুজ্জামান বাবুর গানই বেশি জমে। তখন সন্ধ্যা তার কালির দোয়াত উপুড় করে দিয়েছে, বিদ্যুদ্‌বাতি ঝলসে উঠেছে মঞ্চে; তবু তাকে আমার দরিদ্র, ভীষণ গরিব বলে মনে হয়েছিল, আর নিজেকে মনে হয়েছিল রাজাধিরাজ।

কারণ সুন্দরীতমা তখন দর্শকসারি থেকে গ্রিনরুমে চলে এসে আমার পাশের চেয়ারে বসেছিল, আর আমি তার সঙ্গে কৌতুক বলতে শুরু করেছিলাম।

কৌতুক-বলা আমার নিজের এলাকা। এইখানে আমি বেশ সড়গড়।

একটার পর একটা কৌতুক বলে চলেছি আমি, আর সুরঞ্জনা খিলখিল করে হাসছে।

তারপর হাসি বন্ধ হয়ে আসে একসময়, তাকে মনে হয় অমনোযোগী। একটা চিকন, দড়ি-পাকানো শরীরের ছেলে, বয়স ২২ কি ২৫ কে জানে, মুখে ছোট গোঁফ, ছোট দাড়ি, এসে বলে, রঞ্জু, তুই এখানে, আর আমি তোকে খুঁজি মরি যাচ্ছি।

বাইরে যাবা? রঞ্জু বলে।

হ্যাঁ, চল। মোটরসাইকেল আছে। এক টানে যাবি, আরেক টানে আসবি।

রঞ্জু চলে যায়।

আমি ভাবি, কে এই রাবণ! কে সুন্দরীতমাকে এইভাবে হরণ করে নিয়ে যেতে পারে!

রন্টু কাছেই ছিল। তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলে, ওইটা? ওইটা তো বল্টু চাচা।

বল্টু চাচা আবার কে?

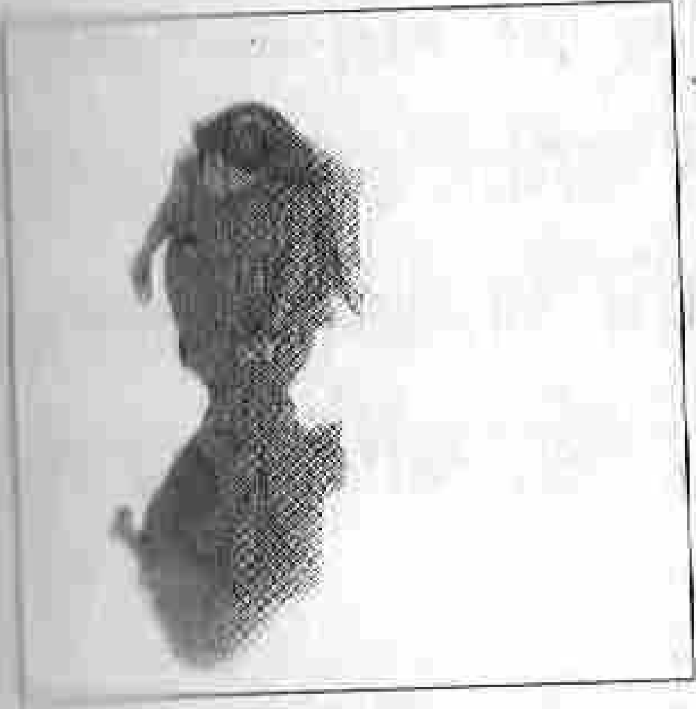
আমার চাচা। আব্বার চাচাতো ভাই। নিজের চাচারই মতন। আমাদের

বন্ধুরই মতন।

কোথায় ও নিয়ে গেল রঞ্জুকে?

কাছেই হবে। আসবে আবার।

রঞ্জুকে বলবার জন্য আমার আরও অন্তত তিন শ কৌতুক প্রস্তুত রাখতে হবে। কবিতায় পুরনারীগণকে সম্মোহিত করবার দিন চলে গেছে, এখন দিন কৌতুককারদের।



আমি একটা কবিতাপত্র বের করি ঢাকা থেকে—তার নাম দিই *উজ্জ্বল উদ্ধার*। হ্যাঁ, প্রিয়তমা, সুন্দরীতমারে, যে আমার উজ্জ্বল উদ্ধার—বুদ্ধদেব বসু অনূদিত শার্ল বোদলেয়ার থেকেই এই শব্দজোড়টি আমি উদ্ধার করেছি, কারণ সুন্দরীতমা কথাটা এই বাক্যটার মধ্যেই জড়িয়ে রয়েছে। রন্টুকে আমার কবিতাপত্রের সহকারী সম্পাদক পদ দিয়ে দিই। সুন্দরীতমার ভাই হিসেবে এটা অবশ্যই তার প্রাপ্য। সেই সূত্রে আমি আর রন্টু দিনের পর দিন কাটাই একই সঙ্গে, একই বিছানায় শুতে হয় আমাদের, অনেক রাত; একই তন্দুর ছিঁড়ে খাই দুজনে, বিজ্ঞাপন সংগ্রহের জন্য ঘুরি অশ্লীল রকমের বড়লোক কিন্তু ভদ্র ধরনের কবিতা না-পড়া মানুষদের কাছে, শাহবাগে বইয়ের দোকানের সামনে বসে থাকি, বিড়ি-সিগারেট খাই, সিগারেটের প্যাকেটে লিখে রাখি পলায়নপর কবিতার সদ্যরচিত পঙ্‌ক্তি, কম্পিউটারের দোকানে বসে প্রুফ কাটি, প্রেসের কালিঝুলি মাখি এক মাস না-ধোয়া জিন্সে...

রন্টুকে আমার ভালোই লাগে, অন্তর্নিহিত একটা কারণ বোধ করি, রঞ্জনা, সুরঞ্জনা চৌধুরী তার বোন। রঞ্জুর কথা মাঝেমধ্যে পাড়ে রন্টু, বলে—তার বোনটি ভর্তি হয়েছে রংপুর রোকেয়া কলেজে, হোস্টেলে থাকে, কী যে করছে না-করছে! চেয়ারম্যান বাবার টাকা প্রতিমাসে উড়ছে, কিন্তু পড়াশোনা সে আদৌ করে কি না, সে চিন্তা কাটে না রন্টুর।

কেন, পড়াশোনা করবে না কেন?

আরে, ওই মেয়েরে আপনি চিনেন না। ফাজিল আছে।

সত্যি রঞ্জুকে আমি চিনি না, কে-ই বা কবে চিনেছে সুরঞ্জনাদের? কিন্তু রন্টু দাবি করে, সে চেনে, আমি ওরে হাড়ে হাড়ে চিনি।

হতে পারে, একই মায়ের পেটের ভাইবোন যখন, তখন তাদের মধ্যে জানাশোনা থাকতেই পারে; ফরহাদ মজহার যেমন লিখেছেন—তোমার সঙ্গে

আমার ছিল মাতৃগর্ভে জানাশোনা।

কিন্তু রঞ্জুকে আমার চেনা হয়ে ওঠে না। তার সঙ্গে আমার সেই অর্থে যোগাযোগ হয় না। আমি অনেক ভেবে বুঝেছি, আমি আসলে লোকটা কাপুরুষ, কোনো মেয়ের দিকে সরাসরি চোখ তুলে তাকানোর ক্ষমতা আমার নেই। আমি নারীকে চাই, ভীষণভাবে চাই, কিন্তু সবই মনে মনে; আমি আসলে একজন প্লেটোনিক প্রেমিক, তাই আমার অস্ত্র তরবারি কিংবা কামান নয়, কবিতা; রসদ আমার খাতা আর কলম। ফুঃ!

আর ঢাকা শহরের মেয়েরাও যে আমাকে ঠিক পাত্তাযোগ্য মনে করে, তা নয়। মোবাইল ফোনের বাহুল্য তখনো শুরু হয়নি, হলে হয়তো আমারও একটা ফোন থাকত, আর আমিও কিছু মিস্‌ড কল পেতাম, কিছু উড়ো কল, কিছু সাইবার-বন্ধু, কিছু অশরীরী শারীরিক সম্পর্ক। না, সেসব কিছুই আমার ছিল না। শুধু দূর নক্ষত্রের মতো, এক কল্পনাসম্ভব প্রেম হয়ে আমাকে আলো দিত সে, যাকে ছুঁতে পাই না, কিন্তু যাকে আমি দেখতে পাই, মাঝেমধ্যে, আকাশে। সুন্দরীতমা আমার কাছে সুদূরতমাও।

ঢাকা শহরে বেসরকারি টেলিভিশন চালু হলে একটা টক শোর উপস্থাপক হিসেবে আমার ডাক পড়ে।

অনুষ্ঠানটির নাম দেওয়া হয় *তুমুল তারুণ্য*। সপ্তাহে এক দিন বিকেলবেলায় সেই অনুষ্ঠানটি দেখানো হয়, তার বিষয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকা তরুণ। তাতে সফল ক্রিকেটার, মডেল, নট তরুণ-তরুণীদের পাশাপাশি কবিতা বা ছবি আঁকার মাধ্যমে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদেরও আমি জায়গা করে দিই। অনুষ্ঠানটি রংপুর রোকেয়া কলেজে দেখানো হয় কি না, তা নিয়ে আমার কৌতূহল হয়। কিন্তু সত্যি বলতে কি, ব্যাপারটা অনুসন্ধান করবার মতো সৎ সাহসও আমার ছিল না।

রন্টুদের বাড়িতে যাওয়ার আরেকটা সুযোগ এসে যায়।

এবার পরিতোষ চক্রবর্তীর কাছ থেকে আমন্ত্রণ আসে নাগেশ্বরী যাওয়ার। নাগেশ্বরীতে এবার হবে পথনাটক উৎসব।

আমিই কিনা তার প্রধান অতিথি!

রন্টু আমার সঙ্গে যাচ্ছে। আমরা দুজন গায়কও নিয়েছি ঢাকা থেকে। মাহমুদুজ্জামান বাবুকে এবার এড়িয়ে যাই সচেতনভাবে। বেটা দাড়িওয়ালার মেয়েভাগ্য বেজায় ভালো। একটা মাইক্রোবাস ভাড়া নেওয়া হয়েছে, ঢাকা থেকে সরাসরি যাবে নাগেশ্বরী; রাতের বেলা অনুষ্ঠান সেরে পরের দিন চলে

আসব আমরা।

আমি বলি, রন্টু, রঞ্জু কোথায়?

ও তো কলেজের হোস্টেলে।

চল, ওকে নিয়ে যাই যাওয়ার সময়।

ওর কলেজ তো খোলা।

আরে শুক্রবার আছে তো। আর একটা রাতই তো। আমাদের সাথে ও ফিরবে।

চলেন।

আহা, কী সুযোগ, কী সুযোগ! আমি আর সুন্দরীতমা, আমরা এক গাড়িতে থাকব অনেকক্ষণ। আমরা দুজন এক গাড়িতে চড়ি, সে-ই আমাদের একটিমাত্র সুখ।

রোকেয়া কলেজ হোস্টেল থেকে তোলা হয় রঞ্জুকে। আমরা খুব ভোরবেলা রওনা দিয়েছি, সকাল ১০টার মধ্যে পৌঁছে গেছি রংপুর শহর; তখন শরৎকাল, রোদে ঝকমক করছে শহর, আকাশ নীল, কলেজ গেটের সামনে দেবদারুগাছে পাতারা যৌবন-সতেজ-সবুজ, রঞ্জু আরও সুন্দর হয়েছে, মনে হচ্ছে আরও ফরসা, আরও লম্বাও।

তার মুখখানি সত্যি শরৎকালের চাঁদের মতো, *গগনের পূর্ণ শশী ভূ-তলে পড়িল খসি* ধরনের। শুধু দু চোখের কোণে তার একটু কালো দাগ পড়েছে, চাঁদের কলঙ্কেরই মতো।

মামা, কেমন আছেন? সে বলে।

আছি রঞ্জু, তুমি কেমন আছ?

আছি, বোঝেন না, হোস্টেলের খাওয়া।

তা ঠিক, তা ঠিক।

আমি ভেবেছিলাম, আজকে দেখা হওয়ার পর তাকে কত কি বলব, কত সাধু সংলাপ, সুরম্য সম্ভাষণ! সেসব কিছুই হয় না, নিতান্ত হোস্টেল, রান্না, ডাল, চচ্চড়ি, হিটার, হলুদ-মরিচ-নুন—এসবে এসে আলাপ ঠেকে।

তবে লাভের মধ্যে লাভ হয়, কোটি টাকার লাভ, মাইক্রোবাসের শেষতম সারিতে আমি আর রঞ্জু বসি পাশাপাশি। চালকের পাশে বসেছে রন্টু, মধ্যের আসনসারিতে ঢাকা থেকে আগত বিখ্যাত দুই গায়ক।

আমার পাশে রঞ্জু। আমার পাশে রঞ্জনা। আমার পাশে সুরঞ্জনা। আমার পাশে সুন্দরীতমা।

ওকে নিয়ে লেখা কয়েকটা কবিতা আমার কবিতাপত্রে আছে, আমি ওর হাতে দিই; বলি, এই কবিতাটা পড়ো।

সে বলে, এখন গল্প করি, পরে পড়ব।

সে এত সুন্দর, তাই তার পাশে বসি, সেরে নিই লঘু আচমন...

হালকা গল্প, হালকা কথা, হালকা কৌতুক; কী হবে কবিতা দিয়ে, যদি না জয় করতে পারে কোনো কাম্য-চিত্ত!

তার চেয়ে কৌতুক ভালো।

'কে?'

'আমি।'

'আমি কে?'

'আপনি কে তা আমি কী করে বলব।'

আরে, আপনি যা হাসাতে পারেন! কৌতুকে কাজ হয়। গল্প করতে করতে আমরা পৌঁছে যাই কুড়িগ্রাম।

নদী পেরোতে হবে ফেরিতে।

আমরা নামি গাড়ি থেকে। আড়মোড়া ভাঙি। সিগারেট জ্বালাই।

রঞ্জু এসে পাশে দাঁড়ায়। বলে, দেন না আপনার সিগারেটটা, একটু টান দিই।

তুমি সিগারেট খাবা?

আরে, সিগারেট নাকি? আপনি খাচ্ছেন, সেইটা একটু খাই না দেখি। বলে সে উল্টোদিকে ফেরে, তার ভাইকে আড়াল করে সিগারেট ঠোঁটে ধরে; একটু আগে ওই সিগারেট ছিল আমার ঠোঁটে, এখন তার; লজিকের সূত্র ধরে বলা যায়, সিগারেট ছুঁয়েছিল আমার ঠোঁট, এখন সিগারেট ছুঁচ্ছে তার ঠোঁট; কাজেই এখন আমার ঠোঁট ছুঁচ্ছে তার ঠোঁট।

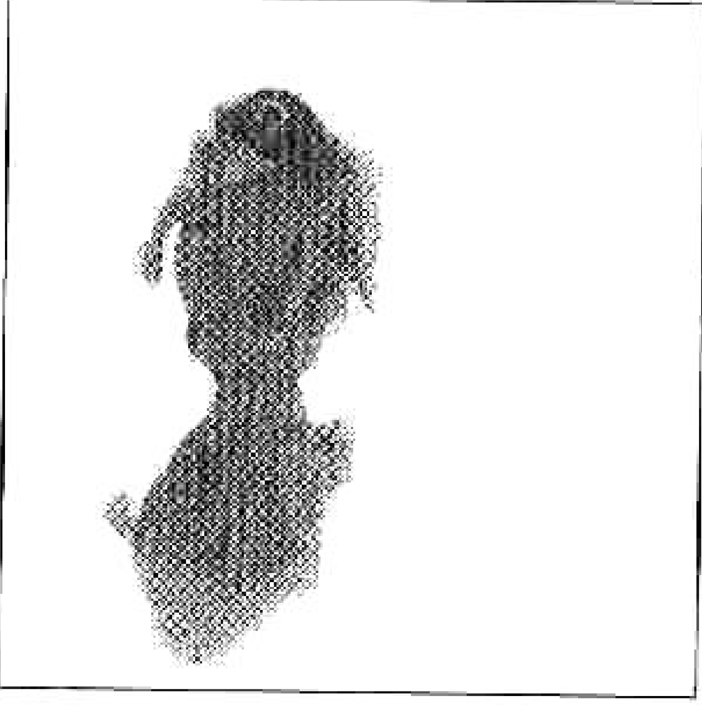
তবু আমার ভালো লাগে না। আমার ভেতরে সহস্র বছর ধরে বাস করা পুরুষ অধিপতিটি জেগে ওঠে, আপত্তি জানায়; সুন্দর সব সময়ই সুন্দর বটে, কিন্তু যখন সে সিগারেট খায়, তখন সে সুন্দর না। মেয়েরা কেন সিগারেট খাবে!

আমার মনে পড়ে, রন্টু প্রায়ই দীর্ঘশ্বাস ফেলত, বলত, তাদের এই বোনটিকে নিয়ে তাদের পরিবার বড় অশান্তিতে আছে।

নদী পার হই আমরা, ধীরে; ফেরি চলে, আকাশে সাদা সাদা মেঘ, আর নীল, আর নীল, আর ওই দূরে একটা বক, একটাই মাত্র বক, সাদা, ধাবমান পানির ওপর স্থির...

আমরা রাতে অনুষ্ঠান করি, সকালে আবার রওনা দিই ঢাকার দিকে, রঞ্জুকে নামিয়ে দিই তার কলেজ হোস্টেলের গেটে; কিন্তু আমার মনটা সত্যি এলোমেলো, ভেতরে খনন, রঞ্জুর একটা কিছু সমস্যা হয়েছে, অবশ্যই।

কারণ রঞ্জু কিছুতেই স্থিরভাবে মন বসাতে পারছিল না। আর সে আমাদের অনুষ্ঠানও দেখেনি, তার সেই বল্টু চাচার সঙ্গে সে কোথায় বেড়াতে গিয়েছিল।



টিভিতে আমার অনুষ্ঠান *তুমুল তারুণ্য* চলছে। মাস শেষে হাজার আটেক টাকা আসে তা থেকে। এখানে-ওখানে কবিতা ছাপা হলে আরও দু-চার শ। দিন চলে যায়।

রঞ্জুর কথা মনের গভীরে কোথাও চাপা দিয়ে রেখে দিই।

উজ্জ্বল উদ্ধার-এর নতুন সংখ্যা বের করবার প্রাণান্তকর চেষ্টায় আবার বুঁদ হয়ে পড়ি।

এরই মধ্যে একজন বিদগ্ধ বিধবার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। তিনি চল্লিশোর্ধ্ব, কিংবা পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই, বিধবা এবং বিত্তশালী। তারও চেয়ে বড় কথা, কবিতায় উৎসাহী।

তিনি আমাকে প্রশ্রয় দেন, আমার কবিতাপত্রের ব্যয়ভার আর আমার যৌবনভার খানিকটা লাঘব করবার দায়িত্ব তুলে নেন সচেতন প্রচেষ্টায়।

আমার তখন কবিতাই প্রেম, কবিতাপত্রই প্রণয়; সুতরাং আমি সহজেই তার হাঁ-মুখে সিথান রাখি।

তিনি আমার মাথা চিবিয়ে খেতে থাকেন।

আমার কবিতাপত্রের মলাট ছাপা হয় আর্ট কার্ডে, যে কাগজ ধবধবে, চকচকে ও পিচ্ছিল। উন্নত কাগজের ওপর পড়ে বহু রং।

আমার কবিবন্ধুরা এ নিয়ে আড়ালে হাসাহাসি করতে থাকে।

সুন্দরীতমাকে নিয়ে আমার কল্পনারাশি কিছুটা রশিবাঁধা তখন। আসলে তাকে তখন আমার মনেই পড়ত না।

এর বাইরেও আমার চৌকাঠে নানা নারীর নানা রকমের উঁকি পড়ে। প্রথমত তা আমার টেলিভিশন অনুষ্ঠানটার জন্য। কেউ বা আমার কাছে চায় টিভি নাটকে অভিনয় করবার সুযোগ, কেউ চায় মডেলিংয়ের রংমহলে উঠবার সিঁড়ি, কেউ বা চায় শুধুই একটুখানি কবিতা পড়তে, ক্যামেরার সামনে।

রঞ্জুকে ভুলে যাওয়া আমার কাছে অসম্ভব হয় না।

এই সময় রঞ্জু একবার ঢাকায় আসে।

আমি তাকে খুব ভালো করে নির্মোহ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করি। আর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে রঞ্জু আসলেই সুন্দর, অসাধারণ সুন্দর, কিন্তু সে সুন্দরীতমা নাও হতে পারে। তাকে সুন্দরীতমা করে তুলেছে আমার কবিতা-পড়া দুরভিসন্ধিভরা মন। শুধু কিছুক্ষণের জন্যই এই উপলব্ধি হয়েছিল আমার। কিন্তু তার আগে ও পরে, এমনকি সে আমাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পরও, কিংবা তার ভয়ঙ্কর থাবা থেকে আমার মুক্তিলাভের পরও, তাকে আমার সুন্দরীতমা ছাড়া আর কোনো নামেই ডাকতে ইচ্ছা করে না।

কিন্তু রঞ্জু একদিন, তাদের পরিবারের বড় দুঃসময়ে, ফিরে আসে; আমার প্রত্যক্ষ জগতে, দৃষ্টির সম্মুখে, ঢাকায়।

আমারও তত দিনে বিধবাপ্রীতির অবসান ঘটেছে। ভদ্রমহিলা একজন শিল্পপতিকে বিয়ে করে থিতু হয়েছেন। আমার পত্রিকাটির প্রচ্ছদ থেকে পিচ্ছিলতার ঔজ্জ্বল্য গেছে ঝরে, এখন আবার বাঁশপাতা কাগজে সে অপরূপ।

রঞ্জু এসেছিল তার বাবার সঙ্গে। চেয়ারম্যান সাহেবকে ভর্তি করা হয়েছে বারডেমে, তাঁর নানা সমস্যা, নানা জটিলতা; কিডনি ঠিকমতো কাজ করছে না, ফুসফুসে পানি জমছে, ডায়াবেটিস তো ছিলই, আস্তে আস্তে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ অসহযোগিতা করতে শুরু করল, অচল হয়ে পড়তে লাগল।

রন্টু তার বাবাকে হাসপাতালে ভর্তি করে। আমি তাঁকে দেখতে যাই।

বারান্দাতেই দেখতে পাই রঞ্জুকে।

রঞ্জু একটু মুটিয়ে গেছে, চোখটা মনে হলো একটু ঠিকরানো, কিন্তু তাতে তার সৌন্দর্যের ঘাটতি খুব বেশি হয়েছে বলে মনে হয় না। সমুদ্র থেকে একপুকুর জল সরালেও কি সমুদ্রের কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে!

চেয়ারম্যান সাহেবকে দেখি, তিনি খুবই কাতর, শুকিয়ে কাঠপ্রায়, তাঁর চোখের নিচে গভীর গর্ত, সেখানে রাজ্যের অন্ধকার।

আমি তাঁর হাত ধরে খানিকক্ষণ বসে থাকি।

রঞ্জু আসে। তার বাবার পাশে দাঁড়ায়।

আমি ভাবি, রঞ্জু যদি এইখানে দরজা আর তার বাবার মধ্যখানে দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে আজরাইলের সাধ্য কী এই ঘরে প্রবেশ করে!

তখনো আমি ছিলাম কবি, বাস্তব জগৎকে ব্যাখ্যা করতে চাইতাম কবিতা দিয়ে।

চেয়ারম্যান সাহেবের হাত ছেড়ে দিয়ে আমি বাইরে আসি, ডেটলের গন্ধমাখা বাতাসে তখন সন্ধ্যার স্পর্শ, এত উঁচু থেকে ঢাকা শহরটাকে খুব সুন্দর আর সবুজ আর বসবাসযোগ্য মনে হচ্ছে; এই সময় রঞ্জু আমার পাশে এসে দাঁড়ায়।

আমি বলি, কেমন আছ, রঞ্জু?

রঞ্জু বলে, ভালো না।

কেন?

আরে, ভাইয়া আমার সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করতেছে।

কেন?

জানি না।

কিছু খেয়েছ?

না, কী খাব! ভাইয়া তো আমাকে কোনো টাকা-পয়সাই দিচ্ছে না।

তুমি আমার সাথে চলো। শাহবাগ থেকে খেয়ে আসি।

না, এখন সময় হবে না। আপনি বরং আমাকে কিছু টাকা ধার দেন; পরে দিয়ে দেব।

আমি তাকে এক হাজার টাকা ধার দিয়ে ধন্য বোধ করি। আর তখন আমার মনে হতে থাকে, এখন কেন আমার কাছে এক লক্ষ টাকা নেই, আমি তো তাহলে তাকে সবটা দিতে পারতাম। রবীন্দ্রনাথ যেমন গেয়েছিলেন, *তোমায় কেন দিইনি আমার সকল শূন্য করে।*

রন্টু বের হয় কেবিন থেকে; বলে, রঞ্জু, ভেতরে যা। রঞ্জু ভেতরে গেলে রন্টু মহা বিরক্ত কণ্ঠে বলে, এই একটা শয়তান মেয়ের জন্য আমাদের পুরা ফ্যামিলিটা শেষ হয়ে গেল।

আমি বিস্মিত। সে-কি! কেন?

রন্টু বলে, আপনি মিঠু মামা, আমার নিজের লোক, আপনাকে বলতে অসুবিধা নাই, হারামজাদি তো ড্রাগস নেয়।

বলে কি রন্টু! এ তো দেখছি কুসুমে কীট! কীটদষ্ট এই কুসুমকে কে বাঁচাবে!

আমি বলি, তোমরা কিছু বল না?

আরে, বলে কী হবে, কারও কথা শোনে নাকি! শয়তানের হাড্ডি একটা।

যন্ত্রণা তো! আমার সমস্ত শরীর কাঁপছে, আমার অস্তিত্বই যেন নড়ে উঠল, আমার সমস্ত শরীরে শীত, আমার মাথাভর্তি ঘাম, আমি এ-কি শুনছি! এ কি

কোনো বিশ্বাসযোগ্য কথা যে নাগেশ্বরীর মতো একটা থানা শহরের একটা সুন্দরী মেয়ে, যাকে কিনা আমি কল্পনা করেছিলাম নিষ্পাপতমা হিসেবে, সে নেশা করে!

ঢোক গিলে আমি বলি, রন্টু, ও কী নেয় রে?

জানি না। মনে হয় আগে গাঞ্জাগুঞ্জা খাইত। এখন ফেনসিডিল খায় হয়তো।

আমার বিস্ময়ের ঘোর কাটে না। স্বীকার করি, আমি নিজে নীলক্ষেতের বাকুশা মার্কেটের বাংলা মদ খেয়েছি কয়েক দিন, দু-চার দিন গাঁজাতেও যে টান দিইনি তা নয়, তবে কোনো দিনও নেশাটা ধরে বসেনি; কিন্তু ফেনসিডিল জিনিসটা ছোটবেলায় আব্বা এনেছিলেন কাশির জন্য, এক ফাইল, সেটি রোজ দু-চার চামচ করে ডোজ মেনে খাওয়ার বাইরে আমি কোনো দিনও ফেনসিডিল ছুঁয়ে দেখিনি।

মনটা দমে যায়, ভীষণভাবে।

আমার কান্না পায়, বারডেম হাসপাতালের উঁচু বারান্দা থেকে আমি একবার আকাশের দিকে তাকাই, একবার নক্ষত্রের দিকে, একবার বেদনার দিকে। অনেক কবিতা লেখা ছাড়া আমার কি আর কিছুই করার নেই!

চোখের জল আমি দেখতে দেব না রন্টুকে।

আমি দ্রুত নেমে আসি। বারডেম থেকে, আকাশ থেকে; মাটির দিকে, বাস্তবতার দিকে।

এও কি সম্ভব?

সুন্দরের এই সর্বনাশ কেন? কিসের জন্য? কার দায়?

আমার মাথা চক্কর দেয়, আমি শাহবাগে হাঁটি, আজিজ সুপার মার্কেটে পাঠক সমাবেশের সামনের ফুটপাতে ধপ করে বসে পড়ি; একটি মোটরগাড়ি, এক দুই তিন, একাধিক, গাড়লের মতো কেশে চলে যায়; কিন্তু দেশটা কোথায় গেল যে নাগেশ্বরীর একটা স্নিগ্ধসুন্দর ফুলের মতো মেয়ের হাতেও চলে আসে ফেনসিডিল! সে সিগারেট খায়, সে গাঁজা খায়, সে ফেনসিডিলের মতো ভয়াবহ মাদকের মধ্যে ডুবে থাকে? ক্লেদজ কুসুম, কাদার মধ্যে ফুটে ওঠা ফুল, লিখেছিলেন শার্ল বোদলেয়ার, কিন্তু এ যে দেখছি কুসুমে ক্লেদ!

একে ফেরাতে হবে না? বলতে হবে না—সুরঞ্জনা, ওইখানে যেয়ো নাকো তুমি? বলতে হবে না, ফিরে এসো ফিরে এসো, চাকা, ফিরে এসো, সুন্দরীতমা?

কে বলবে? কে?

আমাদের বন্ধু সাগরের ছোট ভাই সৈকত তো ফেনসিডিল খেতে খেতে পুরোদমে পাগল হয়ে গেল। বদ্ধ উন্মাদ, আখাউড়া থেকে সে চলে এল একদিন সাগরের ছোট্ট ফ্ল্যাটে, যেখানে সে স্ত্রী, দুই কন্যা নিয়ে নিরিবিলি সংসার পেতে সুখে বিসিএস পাস করা সরকারি চাকরি করছে। উপদ্রবের মতো এল ছোট ভাই সৈকত, দুই চোখ জবা ফুল, চুল ঝড়ো কাক, তার কোনো কিছুরই সংগতি নেই, সে শোবার সময় শোয় না, ঘুমুবার সময় জেগে থাকে, জেগে থাকবার সময় ঘুমুতে যায়, ভাস্তিদের জোরে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়, আর ভাবির দিকে রোষভরে তাকায়। একদিন সাগর যখন অফিসে, সে কামড়ে দিল ভ্রাতৃবধূর হাত, অকারণে।

এখন এই মনোরোগীকে নিয়ে কী করবে সাগর? কোনো ডাক্তারের কাছে তাকে নেওয়া যায় না, নেওয়া হলেও সে কোনো ওষুধ খেতে চায় না। আর সবচেয়ে বড় কথা, বাড়িতে সাগরজায়া বলে দিয়েছে, ও থাকলে আমার বড় ভয় করে, চোখের চাউনি যেন কেমুন গো!

সাগর তাকে মানসিক সদনে নেয়, নেওয়ার জন্য সরকারের কর্তা হিসেবে সে ক্ষমতার বিশেষ ব্যবহার করে; পুলিশ এক রাতে হঠাৎ এসে হানা দেয় তাদের বাড়িতে, গ্রেপ্তার করে সৈকতকে, তারপর সোজা নিয়ে যায় মাদকমুক্তি সদনে। সেইখানে পুরো এক বছর ব্যয়বহুল চিকিৎসা আর রিহ্যাব শেষে সৈকত ফিরে আসে।

এই গল্প আমি শুনেছি সাগরের কাছ থেকে, কাজেই ফেনসিডিল যে খুবই ক্ষতিকর নেশা, এ ধারণা আমার আছে। আর সেই নেশার মধ্যে পড়ে গেছে রঞ্জু!

ও ফিরবে কেমন করে? ওকে ফেরাতে তো হবেই। ফেরাবে কে?



আমি মাঝেমধ্যে বারডেম হাসপাতালে আসি।

রন্টু সব সময় থাকে না। ওদের মা, আমি যাঁকে ডাকি খালাম্মা বলে, কায়ার সঙ্গে ছায়ার মতো, রোগীর পাশে থাকেন অহোরাত্র। আর থাকে রঞ্জু।

রঞ্জু থাকলে আমি তার সঙ্গে গল্প করি। বলি, রঞ্জু, বলো তো, নেশার জগৎটাতে তোমাকে ঢোকাল কে?

মানে? সুদর্শনা সু-অভিনেত্রীও বটে। সে এমনভাবে ভ্রূ কোঁচকায়, কপালে ভাঁজ ফেলে, যেন সত্যি সে নেশা ব্যাপারটার কিছুই জানে না।

মানে, এই যে তুমি নেশা কর...

কে বলল আমি নেশা করি! রঞ্জু আকাশ থেকে পড়ে। আকাশ থেকে নেমে এলেই যে অপ্সরাকে মানাত, সে চমৎকারভাবে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিতে চায়।

আমিও গলা ভারী করে যথেষ্ট মুরব্বিয়ানার সঙ্গে বলি, কে বলল, এইটা তো ব্যাপার নয় রঞ্জু; কী বলল, সেটাই হলো ব্যাপার। এই যে তুমি নেশা কর...

আরে, কী বলে আবোল-তাবোল এই সব কথা! কে বলে, আমি কেন নেশা করব! কোত্থেকে করব?

তাই তো! তুমি একজন উৎকৃষ্ট ভেজা বিড়াল, সিক্ত মার্জার, তুমি তো ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানো না; মাছের এক পাশটা খেয়ে অপর পাশে কিছু নেই ভেবে তুমি ও-রকমই রেখে দাও!

আচ্ছা, অভিনয় করতে হবে না রঞ্জু, আমি সব জানি, সব শুনেছি; তুমি আমাকে বলো, তুমি কী নাও।

কিচ্ছু নেই না। রন্টু আমাকে দেখতে পারে না। ওর কথা আপনি কোনোটাই বিশ্বাস করবেন না। ও তো একটা ভয়াবহ চাপাবাজ।

বটে! রন্টুই চাপাবাজ। আর তুমি, *বিবিসি* বাংলা সার্ভিস, সব সত্য জেনে বসে আছ, প্রচার করছ, প্রতিদিন।

আমি বলি, রঞ্জু, শোনো, আমি তোমার মামা না, আমি তোমাকে হেল্প করব বলে আসছি, আমি তোমাকে হেল্প্ করতে চাই, তুমি সব স্বীকার করো।

হাসপাতালের ওই উঁচু বারান্দার চৌকোনো স্তম্ভগুলোকে সাক্ষী রেখে সে বলে, আরে না, আমি কখনো নেশা করি না। মাঝেমধ্যে একটু সিগারেট খাই, সে তো আপনিও খান, তাই না? বলে সে কোমরের কোন অজানা অঞ্চল থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করে বলে, একটু আগুন দেন না, মিঠু মামা।

আমি বলি, দ্যাখো রঞ্জু, আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি, কিন্তু তুমি সেটা এক্সপ্লয়েট করতে পার না। তুমি ছাড়া আর কেউ আমার কাছে, আমার হাঁটুর সমান বয়সী কোনো ছেলে, সিগারেটের জন্য আগুন চাইলে আমি তাকে থাপড়ায়া এই আটতলা থেকে ফেলে দিতাম।

দেন না, দেন। ইস্, আমার খুব ইচ্ছা হয় এখান থেকে পড়ে দেখি। পড়তে পড়তে যখন বাতাসে চুল উড়বে, কানে বাতাস এসে লাগবে, তখন কী আরাম লাগবে ভাবেন!

এ তো পুরা পাগলি!

রঞ্জু নিজেই সিগারেটটা হাতের ভাঁজে লুকিয়ে কেবিনের ভেতরে গিয়ে একটা দেশলাই-বাক্স নিয়ে আসে; বলে, আম্মার কাছে ছিল ম্যাচ, কয়েল জ্বালাতে লাগে। তারপর সিগারেট জ্বেলে সে বেশ চমৎকার দক্ষতায় আঙুলের ফাঁকে নিয়ে টান দেয় আর ধোঁয়া ছাড়তে থাকে।

এ কী করছে মেয়েটা! হাসপাতাল এলাকা ধূমপানমুক্ত। সে কিছুই মানবে না!

তখন তাকে আমার ভীষণ অসুখী আর অসহায় বলে মনে হয়।

আমার ভীষণ কান্না পায়।

আমি বলি, রঞ্জু, আমার সাথে চলো, আমি তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। এইটা একটা রোগ, চিকিৎসা করালে তুমি ভালো হবে।

আমার কোনো অসুখ নাই, মিঠু মামা। আপনি অযথা টেনশন করতেছেন।

আহ্, কী দারুণ সুচারুভাবেই না সে ধোঁয়া ছাড়ছে তার ঠোঁট দুটোর ফাঁক দিয়ে, যে ঠোঁটকে কমলার কোয়া বলে তুলনা করলে কমলাকে অযথা বেশি দাম দেওয়া হয়, ধোঁয়া ছাড়ছে তার চমৎকার নাসারন্ধ্র দিয়ে, বাঁশির সঙ্গে যে নাকের তুলনা সত্যি অকারণ।

আমি মাথা নাড়ি; কেন নাড়ি, নিজেই জানি না।

আমি রন্টুর সঙ্গে রঞ্জু প্রসঙ্গে কথা বলতে চাইলে রন্টু তা উড়িয়ে দেয় ভেতরের প্রবল হতাশা আর ক্ষোভের প্রকাশ ঘটিয়ে, বাদ দেন তো! মিঠু মামা। ওইটা একটা গন কেস। ওর জন্য আইজকা আব্বার এই অবস্থা। ওর জন্য ভাবতে ভাবতে আম্মাও মারা যাবে। ও নিজে মরলে আমরা বাঁচি।

এইটা কোনো কথা বললা তুমি, রন্টু! একটা মেয়ে, বাচ্চা একটা মেয়ে, বিপদে পড়েছে; তোমরা তাকে কি হেল্‌প্‌ করবা, উল্টা গালিগালাজ করছ। নাহ্‌, কোনো মানে হয় না!

চেয়ারম্যান সাহেবের অসুখ কত দিন চলবে কে জানে! রন্টু একটা বাসা ভাড়া নেয়। সেখানে মাঝেমধ্যে ওদের মা, মাঝেমধ্যে রঞ্জু থাকে।

আর বাকি সময় তারা হাসপাতাল কেবিনে কর্তব্য পালন করে।

আমিও খানিকটা কর্তব্যের টানে, খানিকটা সৌন্দর্যের আকর্ষণে হাসপাতালে যাই, নিয়ম করে, অনিয়মিতভাবে।

তারপর খবর আসে, মোবাইলে—তত দিনে আমার একটা মোবাইল ফোন হয়ে গেছে—রন্টুর বাবা মারা গেছেন।

খবরটা আমাকে রঞ্জুই দেয়, মিঠু মামা, আব্বা আর নাই।

আমি হাসপাতালে ছুটে আসি। তখনো রন্টু আসেনি।

খালাম্মা বিছানায় শুয়ে আছেন, মনে হয় অজ্ঞান; রঞ্জু তাঁর চোখে-মুখে পানি ঢালছে, আর একটা হাতপাখা দিয়ে তাঁকে বাতাস করছে।

রন্টু এসেই চিৎকার করে মারতে যায় রঞ্জুকে, ওই হারামজাদির জন্য আব্বা মারা গেছে। ওই হারামজাদি আব্বাকে খুন করছে।

আমি রন্টুকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করি, ছি রন্টু। এ রকম কোরো না। আশপাশে রোগী আছে, তাদের অসুবিধা হচ্ছে।

না, আপনি সরেন। ওকে আজ আমি মেরেই ফেলব, বলে তেড়ে আসে রন্টু। তার গায়ে মনে হচ্ছে অসুরের শক্তি।

চেয়ারম্যান সাহেবের মরদেহ নাগেশ্বরী পাঠানোর জন্য গাড়ি দরকার। সেটা সহজেই মিলে যায় পিজি হাসপাতাল চত্বরে। আমিই দৌড়াদৌড়ি করি।

শাহবাগের কবিতাকর্মীরাও এসে ভিড় করে হাসপাতালে; পাশে দাঁড়ায় রন্টুর, আমার।

হাসপাতালের কর্মীরা স্ট্রেচারে করে মরদেহ নামিয়ে দেয় গাড়ি পর্যন্ত। পিজির চত্বরেই লোক পাওয়া যায়, যারা লাশ ধুয়ে সাদা কাফনে ঢেকে দেয় দ্রুত। আতর ঢালা হয় প্রচুর। আর ঢালা হয় অঢেল চা-পাতা।

লাশবাহী সেই গাড়িতেই উঠে যায় রন্টু। উঠে যান খালাম্মাও।

রঞ্জু আমাকে বলে, মিঠু মামা, আপনিও চলেন। নাইলে ভাইয়া আমাকে মেরে ফেলবে।

আমি মন্ত্রচালিতের মতো একবস্ত্রে উঠে পড়ি গাড়িতে।

কবিতা লিখেছি, তাই কিছু সামাজিক কর্তব্যের দায় তো আমার ওপর স্বভাবতই বর্তায়।

গাড়ি চলতে শুরু করলে পিজি হাসপাতাল চত্বর পিছিয়ে পড়তে থাকে। উদ্বিগ্ন সতীর্থরা বিদায় জানায় গাড়ির একপাশে দাঁড়িয়ে, তাদের চোখ আমাদের গাড়ির পেছনে আছড়ে পড়ে। তারপর তারা একসময় অদৃশ্য হয়ে যায়।

আমি টের পাই, ওই শোকাভিভূত মানুষগুলো গাড়িটাকে অদৃশ্য হতে দেখে একটা চাপ থেকে মুক্তি পায়।

যাহ্, গেছেগা, অহন চলো মন যে যার কাজে।

চেয়ারম্যান সাহেবের মরদেহ সরাসরি তাঁর গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলে শত শত মানুষ, নারী-পুরুষ, কালো মানুষ, মলিন মানুষ, সাদা-পাঞ্জাবি মানুষ, লুঙ্গি ও গামছা মানুষ, সবজে বিবর্ণ শাড়ি মানুষ ভিড় করে দাওয়ায়। টিনের বেড়া, টিনের চালা সেই বাড়িখানা, যার সামনে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ বা ধান শুকানোর খোলা, সরগরম হয়ে ওঠে।

এত সকালে এত মানুষ যে কোথা থেকে আসে!

সকালবেলাই জানাজা হয়ে গেলে দুপুরের মধ্যে তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে, বাঁশঝাড়ের ছায়ায়, তাঁর মায়ের কবরের পাশে শুইয়ে দেওয়া হয়।

দুপুরের মধ্যেই আমরা ফিরে আসি নাগেশ্বরীর বাসায়।

পাশের বাড়ি থেকে আমাদের জন্য খাবার আসে। আমি নতুন জায়গার নতুন ধরনের রান্না পেয়ে চেটেপুটে খাই।

বিকেল হলে নাইট কোচ ধরার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠি।

কিন্তু রঞ্জুকে কোথাও পাই না। হয়তো রঞ্জুকে কোথাও পাই না বলেই ঢাকার জন্য টানটা দুর্নিবার হয়ে ওঠে।

শুনতে পাই, রঞ্জু তার বল্টু চাচার সঙ্গে কোথাও সটকে পড়েছে।

এই চাচাটাকে প্রথম দিন থেকেই আমার সন্দেহজনক বলে মনে হয়েছিল। এখন আমি একটা অশুভের গন্ধ পাই আমার ইন্দ্রিয়ে।

আমি চলে আসি।

পরের দিনই টিভিতে আমার রেকর্ডিং। *তুমুল তারুণ্য* অনুষ্ঠানের জন্য তুখোড় তরুণ আর তীব্র তরুণীরা অপেক্ষা করছে।

মাইক্রোবাসে কুড়িগ্রাম ফিরে আমি নৈশবাসে উঠে পড়ি।

অগ্রহায়ণের ধানকাটা মাঠের মধ্যে ধান-কুড়ানো ইঁদুরেরা আকাশে মাথা তুলে দেখে ভাঙা সানকির মতো আধখানা চাঁদ।

শিরশির করে ঠান্ডা বাতাস আসে বাসের কাচের জানালার ফাঁক গলে।

আমি আমার কাঁধে ঝোলানো কাপড়ের ব্যাগ থেকে বের করি আমার ট্রেডমার্ক মাফলারটা, কণ্ঠলগ্ন করে টেলিভিশন অনুষ্ঠানের জন্য বাঁচিয়ে রাখি আমার কণ্ঠটাকে।

আর এই আবছায়া অন্ধকারে শেয়াল-ডাকা মফস্বল শহরের কোনো শটিবনের ধারে বসে সুন্দরীতমাটি কদাকার এক পুরুষের সঙ্গে জগতের সবচেয়ে ক্ষতিকর মাদকটি বিশ্রী রকমের বোতল থেকে ঢেলে নিজের কণ্ঠকে বিষাক্ত করে তোলে।

আমি টের পাই।

আমার ঘুম আসে না।

বাস চলে।

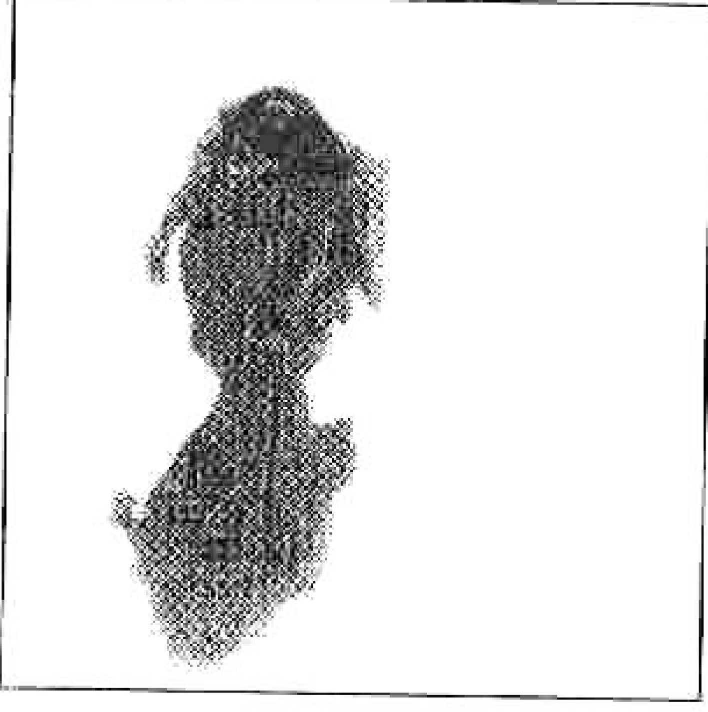
আমার ঘুম আসে।

বাস চলে।

তিস্তা নদীর রেলসেতুর ওপর বাস ওঠে, নিচে শান্ত ঘুমন্ত নদীর আঁচলে বিবশ ঘুমায় আধখানা চাঁদ।

আমি কার্তিকের নবান্নের রাতে ঢাকা ফিরে আসি।

ফেলে রেখে আসি সুরঞ্জনাকে; ভাবি, চিরদিনের মতো।



রন্টুর সঙ্গে আমার দূরত্ব বাড়তে থাকে। কারণ কবিতার চেয়ে টেলিভিশন অনুষ্ঠানটি নিয়েই আমাকে মেতে উঠতে হয় বেশি। কবিতাপত্র উজ্জ্বল উদ্ধার আর বের হয় না। রন্টুও একটা বিজ্ঞাপনী সংস্থায় কাজ নিয়ে নেয়।

আমরা আমাদের মতো করে ভালো থাকি।

কিংবা থাকি না।

একদিন আমার মোবাইল ফোন বেজে উঠলে ওপাশ থেকে ভেসে আসে নারীকণ্ঠ।

নারীকণ্ঠে আমি আর চমকে উঠি না, কারণ টেলিভিশন অনুষ্ঠান করা আরম্ভ করবার পর থেকে নানা রকমের অনুরোধ-উপরোধ আমার জন্য একটা স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মামা, আমি রঞ্জু।

আমার শরীরটা কি একটু কেঁপে ওঠে না, কণ্ঠস্বরের তরঙ্গে লাগে না সেই ঝাঁকুনির রেশ! বলো, রঞ্জু। তুমি কোথায়?

মামা, আমি ঢাকায়।

ঢাকায়?

হ্যাঁ, আমি চলে আসছি। আমি আর রংপুরে পড়ব না। রংপুরে পড়তে আমার ভালো লাগে না।

তাহলে?

আমি ঢাকায় পড়ব।

ভালোই তো। কোন কলেজে পড়বা ঠিক করছ?

না, করি নাই।

আচ্ছা, ঠিক করো। উঠছ কোথায়?

ভাইয়ার ওখানেই উঠছি।

আচ্ছা।

আপনি আসেন। আপনাকে দেখতে ইচ্ছা করতেছে।

আচ্ছা আসব। আমি গাম্ভীর্য ফোটাই গলায়, তবু গলার মধ্যে বাঁশপাতার মতন হালকা কম্পন, আমি টের পাই। আমার হৃৎপিণ্ড হঠাৎই লাফিয়ে ওঠে শুশুকের মতো।

রন্টুদের বাসা আমি চিনি। আমি কি এখনই যাব, নাকি খানিকক্ষণ পরে! এখন তো রন্টু বাসায় নেই, আমার কি যাওয়া ঠিক হবে সেখানে! কেন হবে না! আমি তো ওদের মামা! আমি তো যেতেই পারি!

যাব? গেলে যদি ঘটনা ঘটে যায়! আর যদি কেউ না থাকে বাসায়; কেউ না—না কাজের মেয়ে, না ওদের মা; আর ও যদি আমাকে জড়িয়ে তার বাহুবন্ধনে, তখন...

আমি নিজের সঙ্গে নিজের মোকাবিলা করি, আর অজান্তেই প্রস্তুত হতে থাকি যাওয়ার জন্য, পরে নিই আমার সেরা পাঞ্জাবিটা (মনটা একটু খুঁতখুঁত করে, স্থানীয় বলাকা ড্রাই ক্লিনার্স থেকে ধোয়া ও ইস্তিরি করা, কিন্তু কাপড়ের নিচ থেকে বের করতে গিয়ে এর ভাঁজ খানিকটা নষ্ট হয়ে গেল, আরেকবার একটু ডলে নিতে পারলে ভালো হতো!), একটু সুগন্ধি লাগাই, এমনকি অন্তর্বাসও নির্বাচন করি সচেতন চয়নের মাধ্যমে; বলা তো যায় না, যদি লাইগ্যা যায়...

কিন্তু ঘটনা ঘটে উল্টোটা, অ্যান্টি-ক্লাইমেক্স বলা যাবে যাকে।

আমি রন্টুদের গলিতে যাই, রিকশা ছাড়ি, এক পা দু পা করে এগিয়ে যাই ওদের দরজায়, দোরঘণ্টি বাজাই; দরজা খোলে রঞ্জুই, আমাকে বলে, আসেন মিঠু মামা, বসেন।

আমি বসবার আগেই সে বলে বসে, আপনার কাছে টাকা হবে?

কত?

হাজারখানেক!

না, অত নাই।

কত আছে?

এই তো, শ পাঁচেক।

কী করবা টাকা দিয়া?

আর বলবেন না, গ্যাসের চুলা নষ্ট। খাওয়া-দাওয়া সব বন্ধ।

খাওয়া-দাওয়া বন্ধ? আচ্ছা, তুমি বসো, আমি গ্যাসের মিস্ত্রি ডেকে

আনছি।

আরে, মিস্ত্রি তো আমিই ডাকছিলাম। ও গেছে যন্ত্রপাতি কিনতে। বলছে, সাত শ টাকার মতো লাগবে। আমার কাছে আছে দুই-তিন শ। আপনার টাকা হলে আমার ইজ্জতটা রক্ষা হয়। দেন না। এই রকম করেন ক্যান!

তার চোখে অস্থিরতা। নাকের দুপাশটা ফুলছে, মনে হচ্ছে, রাগ করছে সে আমার ওপর।

আমি অনেক ভেবে এসেছিলাম, টাকা-পয়সা চাইলে আমি দেব না, কিন্তু সাপুড়ে-সম্মোহিত সাপের মতোই আমি তার অনুগত হয়ে পড়ি, অবলীলায় আমার হাত চলে যায় প্যান্টের পকেটে। তাকে সাত শ টাকাই বের করে দিই। আর টাকাটা পেয়ে সে 'আপনি খুব ভালো, মিঠু মামা' বলে একটু হাসে, আর পায়ে স্যান্ডেলের ফিতা লাগাতে লাগাতে বলে, আপনি একটু বসেন, দেখি গ্যাসের চুলার দোকানে যাই, মিস্ত্রি আংকেল মনে হয় বাকি পাচ্ছে না, আমি এক্ষুনি আসব।

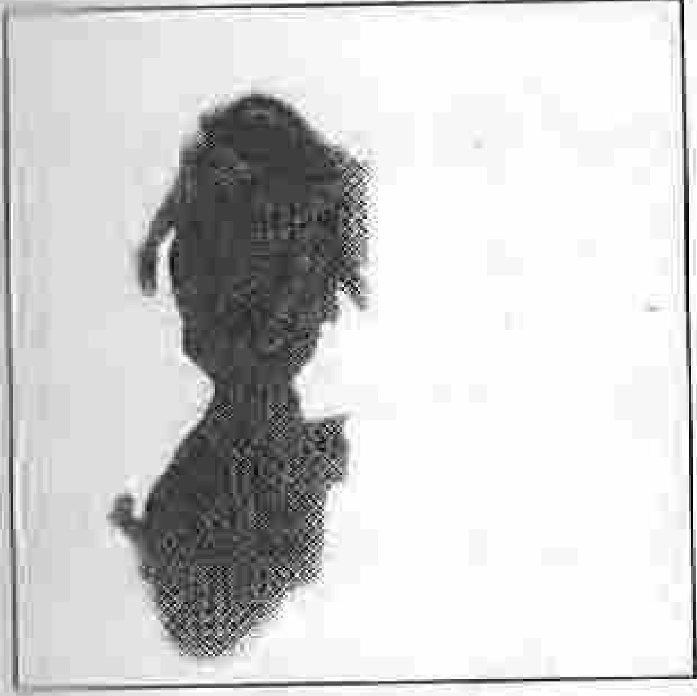
সে আমাকে কোনো কথা বলবার সুযোগ না দিয়েই বেরিয়ে যায়।

আমি বোকার মতো বসে থাকি। তালার চাবি আমার কাছে নেই। অনেকক্ষণ বসে থেকে আমি এ-ঘর ও-ঘর করি। ছোট্ট বাসা। রন্টুর জিনিসপাতি এক ঘরে, আরেক ঘরে রঞ্জুর ব্যবহার্য কিছু জিনিস, এলোমেলো।

অনেকক্ষণ একা একা বসে থেকে আমি বুঝি যে আমি প্রতারিত হয়েছি। আমি রঞ্জুর মোবাইলে অনেকবার ফোন দেওয়ার চেষ্টা করি, কিন্তু সে আমার কল গ্রহণ করে না।

শেষে আমি কল করি রন্টুকে। রন্টু সব শুনে আমার ওপর খেপে যায়। বলে, মিঠু মামা, ওই বদমাইশটাকে আপনারা আরও বদমাইশ বানাইতেছেন। ধেত্তেরি! দ্যাখেন, দরজার কপাটের পিছনে একটা পেরেকে চাবি ঝুলতেছে, নিয়া তালা লাগায়া চাবিটা পাপোশের নিচে রেখে যান। ও কখন আসবে তার কোনো ঠিকঠিকানা আছে নাকি!

তাই তো, আমি কেন বসে আছি! তুমি তো গিয়াছ চলে, তবু আমি কেন রয়েছি দাঁড়ায়ে। যাইগা।



রন্টুর সঙ্গে আমার সাংঘাতিক একটা ঝগড়া আছে।

রন্টু মনে করেছে, আমি রঞ্জুর লোক।

কেন?

কারণ আমি রঞ্জুর হয়ে কথা বলি, ওকালতি করি।

কিন্তু রঞ্জুকে আমি কবে থেকে চিনি! তারও কত আগে থেকে রন্টুর সঙ্গে আমার পরিচয়! ওর সঙ্গে আমি আমার আসন-বসন-বাসনই কেবল ভাগ করিনি; আমি আমার স্বপ্ন, শঙ্কা, সাহস আর কাপুরুষতাও ভাগ করে নিয়েছি—অনেক প্রখর দুপুর আর উন্নিদ্র রাত্রিতে।

রন্টু আমাকে বোঝে না!

আমি যে কেবল কবিতার দাড়ি, কমা, সেমিকোলন, ছন্দ, ছন্দহীনতা নিয়ে কাতর থাকি, তা-ই তো নয়; আমি তো মানুষের একটু সামান্য উপকারে লাগাটাকেও কর্তব্য বলে জ্ঞান করি। আমার বন্ধুরা কি এ নিয়ে অনেক হাসাহাসি করেনি যে মিঠু মহৎ হতে চায়। আমি কি তাদের সঙ্গে ঝগড়া করিনি যে মহৎ হতে চাওয়াও মহত্ত্ব!

তাহলে আমি কেন চাইব না রঞ্জু ভালো হয়ে উঠুক!

সত্য বটে, রন্টুর বোন না হলেও আমি রঞ্জনার জন্য এইটুকু চাইতাম।

হ্যাঁ, সে সুন্দরী বলেই।

হ্যাঁ, তাকে আমি মনে করি সুন্দরীতমা, এবং এও মনে করি, পৃথিবীর সুন্দরীতমাটিকে সমস্ত মালিন্য থেকে, ধূলি-কাদা-জীবাণু থেকে রক্ষার দায়িত্ব আমাকেই তুলে নিতে হবে; কারণ আমি কবি।

কবি তো তিনিই, যিনি সমস্ত পৃথিবীর হয়ে দুঃখ পান।

কবি তো তিনিই, যাঁর সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে ভালোবাসার ঝগড়া, আই হ্যাভ এ লাভারস কোয়ার্‌রল উইথ দ্য হোল ওয়ার্ল্ড, বলেননি কি ফ্রস্ট!

আমি রন্টুকে ফোন করি, রন্টু, তোমার সাথে আমার কথা আছে।

বলেন, মামা।

সামনাসামনি বলতে হবে।

মামা, আমি আমার অফিস নিয়া খুব ব্যস্ত থাকি, ফোনে বললে হয় না!

না, সামনাসামনি বলতে হবে।

সাবজেক্টটা বলেন।

না, দেখা হলে বলি।

আপনি কি রঞ্জুকে নিয়ে কথা বলতে চান?

সেটাও তো বলা দরকার। দরকার না, বলো? আমাদের একটা মেয়ে সেইভাবে অসুস্থ হয়ে থাকবে। কষ্ট পাবে। নিজে কষ্ট পাচ্ছে, তোমাদের সবাইকে কষ্ট দিচ্ছে।

আমি ওকে নিয়া কোনো কথা আপনার সাথে বলতে চাই না, মিঠু মামা। আপনি অন্য আলাপ করেন তো একদিন আসি।

না, অন্য আলাপ না। আগে এইটা ফয়সালা করতে হবে। করতে হবে কি না বলো?

রন্টু ফোন রেখে দেয়।

আমি একদিন আজিজ সুপার মার্কেটের সিঁড়িতে দেখা পেয়ে যাই রন্টুর। ও দ্রুতপায়েই নামছিল, একসঙ্গে দুইটা করে ধাপ পেরিয়ে। রন্টু শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে অফিস করে, অফিসের কাজেও তাকে থাকতে হয় ফিটফাট, নাকের ডগায় একটা সোনালি ফ্রেমের চশমাও লাগিয়েছে সে, তাকে দেখাচ্ছে বেশ!

রন্টু, আমি গলার স্বর উঁচু করি, সোপান-আসন থেকে উঠে দাঁড়াই।

রন্টু থমকে দাঁড়ায়, মিঠু মামা! কেমন আছেন? আরে, আপনি তো টিভি-স্টার। এইখানে মাটিতে লেপটে বসে থাকলে আপনার চলবে?

আমাকে কোথায় বসতে হবে?

স্টাররা থাকবে আকাশে। *টুইংকেল টুইংকেল লিট্‌ল স্টার,/হাউ আই ওয়ান্ডার হোয়াট ইউ আর,/আপ অ্যাবাভ দ্য ওয়ার্ল্ড সো হাই,/লাইক এ ডায়মন্ড ইন দ্য স্কাই।* আপনি থাকবেন আপ অ্যাবাভ দ্য ওয়ার্ল্ড। এইভাবে আজিজ সুপার মার্কেটের সিঁড়ি তো আপনাকে মানাচ্ছে না, মামা।

তুমি বেশ মুডে আছ মনে হচ্ছে। আসো, তোমার সাথে কথাটা সারি।

সারবেন? আচ্ছা। চলেন, ওই কোনায় চলেন।

আমরা একটুখানি নির্জনতা খুঁজে নিই আজিজ সুপার মার্কেটের তিনতলায়।

পিজি হাসপাতালের ভবনগুলো দেখা যাচ্ছে তিনতলার এপাশটা থেকে।

আমি বলি, রন্টু, তোমরা কী করছ? রঞ্জুর চিকিৎসা করাচ্ছ না কেন?

আমি আপনাকে বলছি, ওর কথা আপনি আর মুখে আনবেন না। ও আমার বাবাকে মারছে, শি উইল কিল মাই মাদার, শি উইল কিল মি, শি উইল ডেস্ট্রয় আওয়ার হোল ফ্যামিলি, এভরিথিং।

আমি বলি, রেগে যেয়ো না, রন্টু। মাথা ঠান্ডা করো। উত্তেজনা হলো পরাজয়ের প্রথম সোপান।

আরে মামা, আপনি তো আজকে এই সব বলতেছেন। গত তিনটা বছর আমি আপনার মতো করছি। ও একটা গন কেস। ওইটা নিয়া আপনি আর বেশি দূর আগাইতে পারবেন না। আমি জাস্ট আপনাকে বলি, লিভ দ্য সাবজেক্ট। ও মরলে আমি খুশি হই। যদি পারেন কোনো রেললাইনের ধারে নিয়া গিয়া ওকে রেলগাড়ির নিচে ঠেলে ফেলে দিয়া আপনি ওকে মারেন। আমি ফকিরকে দশটা টাকা দিব।

না রঞ্জু, এটা কী বলো!

বললাম তো।

চলো, তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই।

মামা, সে আমার বোন। আমি চেষ্টা করব না! খালি বোন হইলেও না করলে চলত। সে তো আমাদের পুরা ফ্যামিলির মান-ইজ্জত শেষ করে ছাড়ছে। নিজের প্রেস্টিজের জন্য আমি তাকে ঢাকায় এনে রাখছি। আপনি নাগেশ্বরীতে যাইতে পারবেন না, ওর নামে পোস্টার পড়ছে। কী সব কথা সেই সব পোস্টারে লেখা! মা না-খেয়ে না-খেয়ে আলসার বানাইল। মনে হয় কোন দিন মরে।

বুঝলাম, সব বুঝলাম। কিন্তু চিকিৎসা করালে ও নিশ্চয়ই সারবে।

আমি চেষ্টা করতেছি না! আমি ওকে ডাক্তারের কাছে নিচ্ছি না! আপনার তা-ই ধারণা! জিজ্ঞাস করে দেখেন, আমি কী করি নাই! হাজার হাজার টাকা আমি ওর পিছনে খরচ করছি। এখনো করতেছি। কিন্তু হারামজাদির নিজেরে তো ভালো করতে চাইতে হবে। ওর তো নিজেকে মিন করতে হবে, আমি ভালো হইতে চাই।

শোনো, তুমি যেভাবে রেগে আছ, এইভাবে করলে তো চলবে না। মাদক

নিরাময়ে চাই পরিবারের সকলের ভালোবাসা। দ্যাখো নাই, রাস্তায় পোস্টার, স্টিকার?

আপনি তো বললেন একটা থিয়োরিটিক্যাল কথা। ওকে আমি ভালোবাসি না! আমার বড়পা ওর জন্য কানতে কানতে চোখে ঘা বানায়া ফেলছে। বেচারি এখন সারা দিন খালি মাজারে মাজারে ঘোরে। মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এখন আমাদের সবারই মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। আমরা এখন রাস্তায় রাস্তায় ন্যাংটা হয়া নাচব। আইসেন, দেখতে আইসেন।

কী বলো এই সব, তুমি!

খালি হাতে আইসেন না। আপনার টিভি ক্যামেরাটা নিয়া আইসেন। ছবি তুইলা টিভিতে দেখায়েন। নাকি টিভিতে ন্যাংটা পাগলার নাচ দেখানো নিষেধ আছে?

চ্ছু। কী যে তুমি বলছ না, রন্টু!

এই জন্য তো বলছিলাম, এই সাবজেক্ট নিয়া কথা বইলেন না। বললে আমি দশকথা শুনায়া দিব। ওপর দিকে থুতু দিলে তো নিজের মাথায়ই পড়ে, নাকি? নিজের বোন। বেশি কথা বলতেও পারতেছি না। যান, যান তো!

আমি কি একটা চেষ্টা করব?

করে দেখেন, যদি পারেন।

কাইলকা আসি তাহলে তোমাদের বাসায়।

কখন আসবেন?

সন্ধ্যায় আসি। ডাক্তারের সাথে অ্যাপয়েন্ট করে রাখব। তারপর ওকে নিয়ে সোজা যাব চেম্বারে।

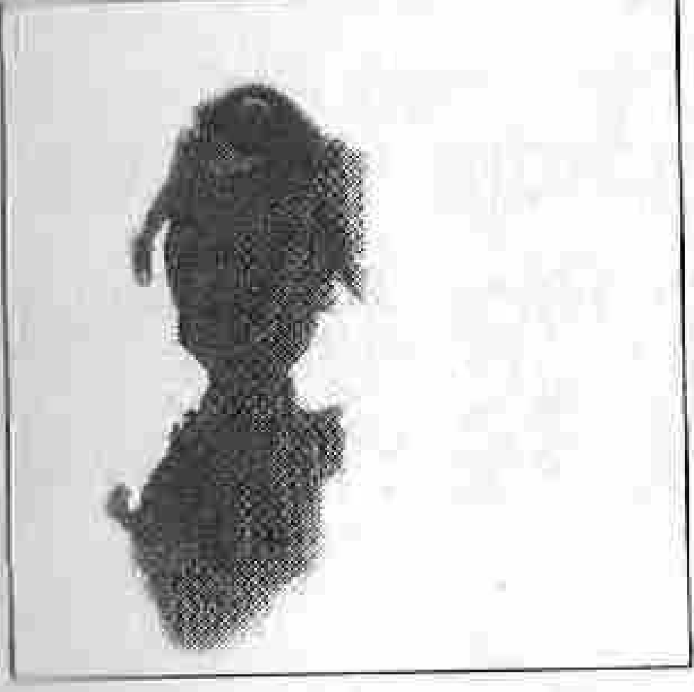
আচ্ছা যাইয়েন।

রন্টু হাসে, বোঝাই যায়, সেই হাসিতে পরাজিতের বেদনা—যাবার সময়, দিস্তা দুয়েক প্রেসক্রিপশন আছে, নিয়া যাইয়েন।

রন্টু নেমে যায়, সিঁড়ি বেয়ে। বিকেলটা সন্ধ্যার কাছে চলে গেল, সন্ধ্যার টি-ব্যাগ মিশে যাবে বিকেলের গরম জলে, তখন আস্তে আস্তে পুরোটা পানি কালো হতে থাকবে।

আমি রন্টুর চলে যাওয়া দেখি না, কিন্তু তার জুতার ঠক ঠক আওয়াজ মিলিয়ে যেতে শুনি।

রন্টু কি কম-দামি জুতা পরেছে নাকি, এত শব্দ হয় কেন তার জুতায়?



'মাদক নিরাময়ে চাই ভালোবাসা'—দেয়ালে লাগানো একটা স্টিকারের দিকে চোখ যায়। ভালোবাসা কথাটার দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকি। খুব ভালো লাগে শব্দটাকে, জিভে জল চলে আসে। আশ্চর্য তো, ভালোবাসা শব্দটার দিকে তাকিয়ে থাকলে জিভে পানি আসবে কেন?

আমাকে ভালোবাসতে হবে। ভালোবাসা পেতে হবে। ভালোবাসা দিতে হবে। না দিলে ভালোবাসা পাওয়া যায় না। ভালোবাসার মানে কিন্তু পাওয়া নয়, দেওয়া। যে যত বড় প্রেমিক, সে তত বেশি দিয়ে গেছে; দিতে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছে কেউ কেউ। তবু তার আনন্দের সীমা নেই। সে সার্থক। ভালোবাসা হলো সেই জিনিস, যার সার্থকতা নিজেকে নিঃশেষিত করায়।

এই সব বড় বড় ভাব আমার মাথার মধ্যে কাজ করছে। রঞ্জুর জন্য, সুরঞ্জনার জন্য, আমার সুন্দরীতমার জন্য আমি কি এই কাজটা করব না?

সমাজে আমার অবস্থান ইত্যাদি মিলে তাকে আমার ভালোবাসার কথা বলা যাবে না। হাজার হলেও সে আমার ভাগ্নি। কিন্তু গোপনে, নিভৃতে তাকে ভালোবেসে যদি সারিয়ে তুলতে পারি, তাহলে তো কেউ আপত্তি করবে না। আমার ভালোবাসাও সার্থক হবে। আমি সম্রাট শাহজাহান নই যে তাজমহল গড়তে পারব, কিন্তু ভালোবেসে শুশ্রূষা জুগিয়ে তাকে উপশম তো জোগাতে পারি!

পারি কি পারি না!

নিশ্চয়ই পারি। তবে করি না কেন!

তাকে নিয়ে যাব ডাক্তারের কাছে, ভেবে একদিন তার কাছে যাই। রন্টুদের বাসায়, সুরঞ্জনার কাছে। বেল টিপি। দরজা খোলে রঞ্জুই। একটু সময় নেয়, আমার নাড়ির গতি বাড়িয়ে। তুমি আসছ না, তুমি আসছ না, তোমার আসতে কয়েক হাজার বছর লাগবে!

তিনি এলেন। দরজা খুললেন। বললেন, মামা, আপনি!

তোমাকে না সকালে ফোন করে বললাম, বিকেলে আসব।

আচ্ছা, আসেন আসেন।

ভেতরে দেখি একটা ছেলে বসে আছে। কানে দুল, ঠোঁটের ওপরে নয়, নিচে গোঁফ। জিন্সের প্যান্ট শুধু রংচটা নয়, মনে হচ্ছে এটা দিয়ে হাঁড়ির তলা মোছাটোছা হতো। আর প্যান্টটা পড়ে যাচ্ছে, ব্যাটার পাছা হাঁটু পর্যন্ত নেমে এলেও এই প্যান্টে সেটা কভার করা যায়।

সারা ঘরে তামাকের গন্ধ। নিজে সিগারেট খাই, কাজেই তামাকের গন্ধ নাকে লাগবার কথা নয়, কিন্তু পরিস্থিতি এতই উৎকট যে আমারই ধাক্কা লাগল প্রবল। সিগারেটের অবশিষ্টাংশ পড়েও আছে ঘরের মেঝেতে।

মামা, আপনার সাথে পরিচয় করায়া দেই। ওর নাম মাসুম, আমার বন্ধু।

আমার জীবনেও আমি এই রকম মাসুম দেখি নাই, নিষ্পাপতার চূড়ান্ত উদাহরণ এই ছেলেটি।

আমি বলি, তুমি তো বিজি। আজকে থাক তাহলে, পরে আসি।

আচ্ছা।

মনটা দমে যায়। ভালোবাসা আর বাড়াইতে চায় না, বরং মুখ লুকানোর জন্য ইন্দুর-মিন্দুরের গর্ত খোঁজে। হা-লা। কী একটা মাসুমকে নিয়া সে বসে আছে! হাম তুম এক কামরে মে বন্দ্ হো, অর চাবি খো গেয়ি...

তবু সে তো সুন্দরীতমা। *কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘপথ...কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে...এখনই অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা...*

একদিন তাকে পেয়ে যাই মওকামতো। সে বাসায়, রন্টুও।

আমি বলি, রঞ্জু, আমার সাথে একটু চলো।

কোথায়?

বাইরে।

চলেন, মিঠু মামা। বাইরে কোথায়?

বাইরে মানে এই একটু বেড়ালাম-টেড়ালাম আর-কি!

রিকশায়? মজা হবে, চলেন!

চলো।

রন্টু, তুমি যাবা? চলো। আমি গলা চড়াই।

না, আমি যাব না। আপনারা যান।

আরে চলো না!

বললাম তো, যাব না।

আরে চলো।

রঞ্জু বলে, আমরা আসলে যাবটা কোথায়?

আমি বলি, এই একটু রিকশায় ঘুরব। তারপর কিছু খাব কোথাও একটু দাঁড়িয়ে। তারপর হয়তো একটু ডাক্তারের কাছে যাব।

রঞ্জু বলে, কেন, ডাক্তারের কাছে কেন? আপনার কোনো প্রবলেম আছে নাকি?

আমিও একটু দেখালাম। তুমিও একটু দেখালা।

আমার তো কোনো প্রবলেম নাই, আমি কেন দেখাব? রঞ্জু বিরক্ত।

না থাকলেও মাঝেমধ্যে চেক করাতে হয়, রঞ্জু।

না, আমি যাব না।

চলো, ঠিক আছে, ডাক্তারের কাছে যেতে হবে না; এমনিই বেড়াতে যাই, চলো।

না, আমি আপনার সাথে যাব না। কেন যাব?

এই যে তোমার একটা প্রবলেম আছে, ড্রাগসের প্রবলেম?

ড্রাগস? সেটা কী জিনিস?

ও, কিচ্ছু বোঝো না! এই যে তুমি ফেনসিডিল খাও?

কী ডিল খাই?

ফেনসিডিল।

সেইটা আবার কী জিনিস?

রন্টু চিৎকার করে ওঠে, ওই হারামজাদি, ন্যাকামো করিস? আমার সামনে ন্যাকামি করিস? ফেনসিডিল কী তুই জানিস না? জানিস না...সে সোজা গিয়ে চুলের মুঠি ধরে রঞ্জুর, দুই ভাইবোনে মারামারি লেগে যায়...আমি থামাতেও পারি না। বাপ রে...রঞ্জুও ধপাধপ কিল-চাপড় মারতে থাকে, খামচে ধরে বোতাম ছিঁড়ে ফেলে, ভাইয়ের শার্টের বোতাম...আমার কথা কেউ শোনে না; আমি কাকে নিরস্ত করব বুঝি না, রঞ্জুকে ধরতে গেলে রন্টুর আক্রমণ চণ্ড হয়, রন্টুকে ধরতে গেলে রঞ্জুর নখ-দাঁত আগ্রাসী হয়ে ওঠে...

রন্টু বলে, আপনি, মিঠু মামা, আর কখনো আসবেন না। আপনার প্রশ্রয় পেয়ে পেয়ে ও আরও খারাপ হইতেছে। আপনি ওকে টাকা-পয়সা দিয়া দিয়া আরও বখা বানাইতেছেন।

কী-জানি! হতেও পারে। নাকি আমি যা দিই না, সেসবও রঞ্জু আমার

নামে চালায়। নেশাসক্তদের আবার টাকা-পয়সা আয় করবার নানা ফন্দিফিকির থাকে।

আমি চলে আসি—ত্যক্ত, বিরক্ত, ব্যর্থ আর বিফলকাম।

আমার স্যান্ডেল মা ধরণীকে ব্যথা দিতে দিতে আসে।

মনে মনে ঠিক করি, আর যাব না। কেন যাব? সে কে? সে আমার কী হয়?

যে আমার পাশে বসে সে আমার হয় না কিছুই,
চিবুকে জলের দাগ, আমি তাকে ছুঁই বা না ছুঁই।



তাকে ফোন করব না। তার কাছে আর যাব না। সে ফোন করলে তার ফোন ধরবও না। এই প্রতিজ্ঞা নিয়েই চলে যাচ্ছিল দিন। ভালোই যাচ্ছিল। ক্লাস নাইনে পড়া, আমার হাঁটুর সমান-বয়সী একটা আধপাগলির সঙ্গে এসএমএস চালাচালি ছাড়া এই সময় আমি একেবারেই নিঃসম্পর্ক।

গুণদার (নির্মলেন্দু গুণ, কবি) সঙ্গে দেখা হলে আমি বললাম, দাদা, আপনি একাই মুঠোফোনে পদ্য লেখেন না, আমিও লিখি। তবে আপনার বই বাজারে আলোড়ন সৃষ্টি করছে, আমারটার কোনো পাবলিশার পাচ্ছি না।

এ ব্যাপারে তো আমি তোমাকে হেল্‌প্‌ করে দিতে পারব না, তাই না? তুমি তো আমার পারমিশন নিয়া লেখা শুরু কর নাই। তোমারটার দায়দায়িত্ব তোমার। আমারটার দায়দায়িত্বই আমি নেই না, তোমারটার নিব কেমনে?

গুণদা, দেখেন, আপনার মতো আমিও লিখছি।

শোনো, তুমি কি তোমার মুঠোফোনের কাব্য দেখানোর জন্য আমার মতো দাড়িওয়ালা লোক বাছছ নাকি? সর্বনাশ! কোনো পাঠিকাকে পাঠাও। সে সব ঠিকঠাক কইরা লেইখা দিলে হবে। মুঠোফোনের কাব্যের এইটাই নিয়ম। দাড়িওয়ালা বুড়া কবির উদ্দেশে লিখিত হইলে সেই কাব্যর কোনো ভবিষ্যৎ নাই। হা হা হা।

শাহবাগের পাশে, পরীবাগের মোড়টাতে গুণদা আড্ডা দেন। সেখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা। তিনি পারিষদবেষ্টিত। হাতে চায়ের কাপ।

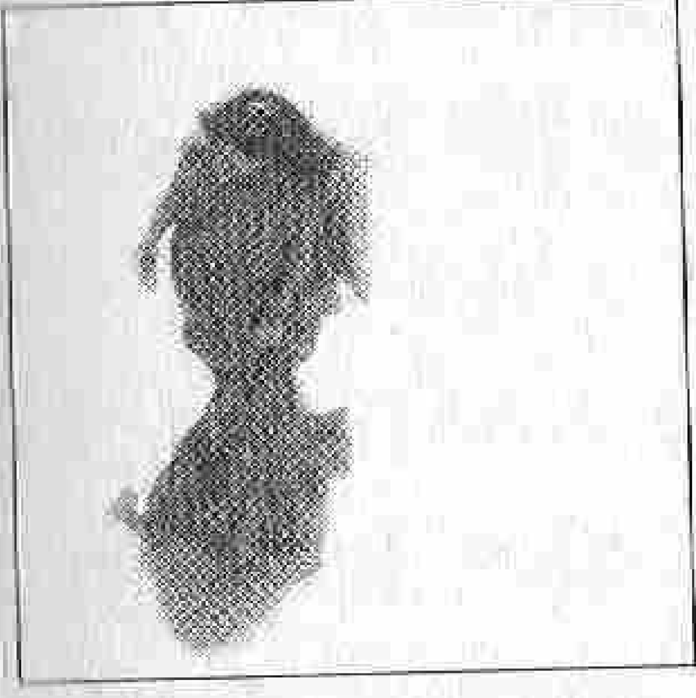
আমি তাঁর নম্বরে তবু এসএমএস করে দিই কালকে ওই বালিকাকে পাঠানো পদ্যটা :

Raat dupure tomai likhi balika
poddo amar tomai pabe khali ga

গুণদার মোবাইলের মেসেজ টোন বেজে উঠলে তিনি সেটা খোলেন।

পড়ে বলেন, এই মিঠু, তুমি পাঠাইলা। আমি বলি, কী জিনিস? বলে হাসি। গুণদা বলেন, শোনো, নকল কোনো দিন আসলরে ছাড়াইতে পারে না। Bata-র জুতার বদলে Bala-র জুতা কি চলে! আমারটা হইল খাঁটি লেদারের জিনিস। তোমারটা হইল ফোমের। চলবে না।

চায়ে চুমুক দিয়ে গুণদা গোঁফ ভিজিয়ে ফেলেছেন। কবির কবিত্বময় আউলা ভাব দেখে আমি হাসি।



যখন ঘুম ভেঙে যায় সুন্দরীতমার, যখন সে আমাকে তার দু হাতের বেড়িতে কাছে টেনে নেয়, আমার কানে মুখ ঘষে, আর আমাকে খুব আলতো আদরে নাজুক করে দিয়ে বলে, মিঠু সোনা, আমাকে তুমি তাড়ায়া দিয়ো না, আমি তোমার কাছে থাকতে চাই। চিরজীবন! তখন আমি কী করতে পারি?

এই কথাটা আমি কোনো দিনও তাকে বলতে পারিনি। এই যে তাকে আমার ভালো লাগে, তাকে আমি স্তোত্র করি; না, ভাগ্নি হিসেবে নয়, নারী হিসেবে, সুন্দরীতমা হিসেবে; এই কথাটা তো তাকে আমি কোনো দিন কোনো ইঙ্গিতেও বলিনি...

এই যে আমি আমার পত্রিকার নাম রেখেছিলাম *উজ্জ্বল উদ্ধার*, তাও তো তাকে ভেবেই—প্রিয়তমা, *সুন্দরীতমারে, যে আমার উজ্জ্বল উদ্ধার*—

অতএব, আমি তার মুখখানি এবার আমার বুকের মধ্যে টেনে নিই; তাকে বলি, রঞ্জু, রঞ্জনা, সু, আমি তোমাকে আমার বুকের মধ্যে ভরে রাখব, কেউ তোমাকে নিতে পারবে না। কেউ না।

মোবাইল ফোন অন করে দেখি, বার্তায় ভরে আছে মুঠোফোনের পর্দা, আমি খুলি।

সিয়াম লিখেছে, তোর খোঁজে পুলিশ এসেছিল। তুই কোথায়?

পুলিশ আমার খোঁজে ইন্টার্নি হোস্টেলে গিয়েছিল। আর তাদের থেকে মাত্র কয়েক শ গজের ভেতরে আমরা দুজন আমাদের প্রথম বাসর কাটিয়েছি একটা ট্যাক্সির ভেতরে।

এখন তাহলে আমরা কোথায় যাব?

কোনখানে যাওয়াটা সবচেয়ে নিরাপদ হবে আমাদের জন্য? কোনখানে গেলে কেউ আর আমাদের খুঁজে পাবে না, আমাদের থাকতে দেবে আমাদের মতো?

রন্টুর ফোন আসে, আমি ধরি না। মোবাইল বেজেই যায়। রঞ্জু বলে, জান, কে ফোন করতেছে এত?

আমি বলি, রন্টু।

ধইরো না।

না, ধরতেছি না; কিন্তু কোথাও তো যাওয়া দরকার।

কোথায় যাবা?

জানি না।

চলো কোথাও। একটা বিছানা পাইলে ভালো হইত। একটু শান্তিমতো ঘুমাতে পারতাম।

সমস্যা তো। সত্যি, কোথায় যাওয়া যায়! আর একটা বিছানা পেলে সত্যি ভালো হতো। আমিও ওকে জড়িয়ে ধরে শান্তিমতো ঘুমাতে পারতাম।

একবার মনে হয়, চলে যাই হোটেল সোনারগাঁও কি শেরাটনে; একবার মনে হয়, যাই, শুয়ে পড়ি কোনো ছইতলায়, বস্তিঘরে, যেখানে ভিক্ষুকেরা ঘুমায় গর্ভিণী স্ত্রী আর পেটে-পিলে গোটা ছয়েক বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে; কী করব এখন, কোথায় যাব, কোথায় যাওয়া চলে?

মোবাইল ফোন বেজে ওঠে আবারও, রন্টুই; এবার আমি ধরি, হ্যালো, রন্টু?

মিঠু মামা, যা হওয়ার হইছে, এখন আপনি রঞ্জুকে দিয়ে যান। আপনি জানেন না, এই ঢাকা শহরে থাকলে ও মারা যাবে, স্রেফ মারা যাবে; নিজে তো মরবে মরবে, আমাদেরও মারবে।

আমি বলি, রন্টু, ও এখন ঢাকা শহরে নাই, কাজেই ওর মারা যাওয়ার আর সম্ভাবনা নাই।

আপনারা কোথায়?

আমরা? বরিশালের লঞ্চে চড়ে বরিশাল চলে এসেছি।

ধেত্তেরি! রাত দেড়টায় বরিশালের লঞ্চ কোথায়?

তোমাকে বলব কেন। খালি জেনে রাখো, আমরা ঢাকায় নাই।

স্যার, কী করবেন। ট্যাক্সিওয়ালা আবার তাড়া দেয়। তার কণ্ঠে হতাশা।

আমি বলি, রঞ্জু, আমরা এখন সোজা কাজি অফিসে যাব। তুমি যাবে?

ও আমার ঠোঁটে আলতো করে ঠোঁট রেখে বলে, যাব গো।

সিয়ামকে ফোন দিতে হয়, বাবুকে; তারা আসে, মগবাজার কাজি

অফিসে। নিতাই সাহা আসেন গাড়ি চালিয়ে, তাঁর এনজিও থেকে।

কাজি সাহেব যা যা বলেন, আমরা সেই অনুযায়ী কাজ করি।

নিতাই সাহা আমাকে উপস্থিত দশ হাজার টাকা ধার দেন, তা দিয়ে বিয়ের রেজিস্ট্রি খরচ দিয়েও কিছু বাঁচে।

দুই লাখ এক টাকা দেনমোহরানা ঠিক করে, এক হাজার টাকা নগদ, এক লাখ নিরানব্বই হাজার এক টাকা বাকিতে আমাদের বিয়ে সুসম্পন্ন হয়। রঞ্জু, খুবই স্মার্ট মেয়ে, নাগেশ্বরী তো নাগেশ্বরী, ঢাকা-কলকাতার মেয়ের চেয়েও সহজভাবে, সাবলীলভাবে রেজিস্ট্রি ফরমে স্বাক্ষর করে দেয়।

বিয়ে হয়ে গেলে আমরা উঠি নিতাইদার ছোট্ট সাজানো ফ্ল্যাটে, উপদ্রবের মতো; নিতাইদা স্টার হোটেল থেকে কাচ্চি বিরিয়ানির প্যাকেট কিনে নিয়ে আসেন, ওখানেই আমরা সবাই, বিয়ের অভ্যাগতরা মধ্যাহ্নভোজ সেরে নিই।

তারপর বউদি আমাদের তার চিলড্রেন'স রুমে ঢুকিয়ে দিয়ে বাচ্চাদের স্কুল থেকে আনতে চলে যান।

আমরা, আগের রাতের নির্ঘুমতায় ক্লান্ত, বিছানায় এলিয়ে পড়ি।

আমি রঞ্জুর মুখখানা আমার বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বলি, সাবলীলভাবে, আমি ভালোবাসা বাসিব তোমায়। শোনো, আমি ভালোবাসা দিয়ে, অনেক অনেক ভালোবাসা দিয়ে তোমাকে সুস্থ করে তুলব। তারপর মোবাইলে ফোন করি রন্টুকে; বলি, রন্টু, রঞ্জুকে পাওয়া গেছে, ও তো আজকে সকাল ১০টা-১১টার দিকে মগবাজার কাজি অফিসে গিয়ে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করে ফেলেছে।

বিয়ে করছে? কাকে করল?

আর কেউ রাজি হচ্ছিল না। শেষে আমাকেই রাজি হতে হলো।

মিঠু মামা, আপনি জানেন না, আপনি কত বড় ভুল করলেন! কত বড় ভুল! সারাটা জীবন এই ভুলের খেসারত আপনাকে দিতে হবে।

রন্টু, তোমরা বড় অন্যায় করেছ মেয়েটার সাথে। অন্যায় আর ভুল। আমাকে সেই সব ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কী আর করাকরি।

বড় বড় কথা বইলেন না তো মিঠু মামা! বড় বড় কথা শুনলে গা জ্বলে।

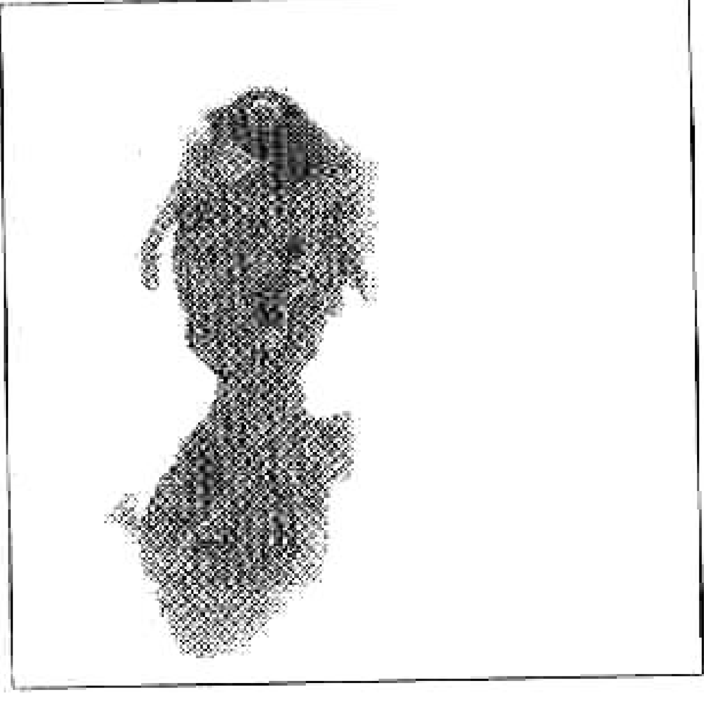
শোনো, তুমি আর তোমার বোনকে খুঁজে মোরো না। আর তোমার ওই আংকেল না কে, বড় পুলিশ, ওনাকেও বলে দিয়ো, ধর্ম ও আইনমতে আমরা বিয়ে করেছি। দুজনেই সাবালক। উনি যেন আর দুশ্চিন্তা না করেন। ওনার ভাস্তি ভালোই থাকবে। তুমিও চিন্তা কোরো না। তোমার বোন ভালোই

থাকবে।

মরুকগা না, আমি কেন চিন্তা করতে যাব! এইবার আমার চিন্তা আপনাকে নিয়া। আপনি বুঝবেন। একদিন বুঝবেন, রন্টু কেন এত চিল্লাচিল্লি করছিল। রাখি।

রন্টুই ফোন কেটে দেয়।

বউদি এসে বাইরে থেকে দরজা লাগিয়ে দিয়ে বলেন, আমি বাইরে থেকে তালা-চাবি দিয়ে দিলাম। তোমাদের দরকার হলে আমাকে মিস্‌ড কল দিয়ো।



ভেবেছিলাম, ভালোবাসা হবে সারা রাত। দিনের বেলা ঘুমুব আর রাত কাটাব ভালোবাসায়।

কিন্তু বিকেল হতে না হতেই ঘুম ভেঙে যায় : মিঠু, মিঠু, ওঠো না, সোনা। ওঠো।

আমি তার ডাক শুনে জাগি, তার কথা শুনে পাশ ফিরে শুই; সে বলেই চলে, মিঠু, মিঠু, এই মিঠু মামা, ওঠেন না।

মিঠু মামা? এক মুহূর্তেই মিঠু মামা হয়ে গেলাম। তাহলে এতক্ষণ কি স্বপ্ন দেখছিলাম!

ওঠো, সোনা।

আমি তাকে জড়িয়ে ধরি, তার শরীরের ঘ্রাণ নিই, তাকে বলি, কী হয়েছে, জান?

চলো না একটু বাইরে যাই, চলো না।

কেন? এই তো বেশ আছি।

আমাকে একটু বাইরে যেতে হবে। তোমার ঘুম ভাঙাতে চাইনি। কিন্তু আমাদের দরজা তো বন্ধ। আমি বার হতে পারলাম না।

বাইরে তোমার কী দরকার? বাথরুম ওই তো...ঘরের ভেতরে বউদি তো সব দিয়ে দিয়েছেন। খাবার-দাবার। পানি। সব...

না গো। চলো তো...প্লিজ প্লিজ প্লিজ...

আচ্ছা যাব। কোথায় যাবে, বলো।

রিকশায় ঘুরব দুজন। সন্ধ্যার সময়টা রিকশায় ঘুরতে আমার খুব ভালো লাগে। খু-ব।

আচ্ছা, তুমি যখন বলছ, যাব। অবশ্যই যাব।

উঠি। চোখ-মুখ ধুই। বউদিই দরজায় নক করে বলেন, এই, চা খাবে

নাকি, ওঠো।

আমরা বাইরে আসি।

বউদি বলেন, চা খেয়ে যাও।

আমার মাথা ধরেছে। চা-টা খেলে আমার ভালোই লাগত। কিন্তু রঞ্জু বলে বসে, থাক, বউদি। আমাদের চায়ের অভ্যাস নাই। আমরা একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি।

বউদি, ফরসা, গোল, খুব লম্বা নন, কপালে সিঁদুর, সব সময় হাসিখুশি, বলেন, আচ্ছা আচ্ছা, চা নাহয় না খেলে, একটু বিস্কিট মুখে দাও। নাও...

হাতে একটা করে বিস্কিট নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়ি।

কই যাবা। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে, যখন সিঁড়ির মধ্য ধাপের আলো আমাদের ছায়াগুলোকে একবার সামনে একবার পেছনে নিয়ে যাওয়ার খেলা খেলছে, আমি তাকে বলি। ঘুমিয়ে উঠে তার চেহারা সুন্দর দেখানোর কথা, কিন্তু তা দেখাচ্ছে না, এই ফিলিপস বাতির নিচেও না, বাইরে বিকেলবেলা হলদে আলোতেও না, কারণ তার চাউনির মধ্যে অস্থিরতা।

আর সে কারণেই আমার মনের মধ্যে ভয়।

আমি আবার বলি, কোথায় যেতে চাইছ, বলো তো!

সে বলে, আসো না।

সে আমাকে নিয়ে যায় নীলক্ষেতে, বইয়ের দোকানগুলোর পেছনে, একটা বস্তিতে। কী ক্ষিপ্রতায় যে সে ছুটছে!

এমনিতেই ঘুম থেকে জেগে উঠে পাওয়া সন্ধ্যা মানেই একটা ভয়ঙ্কর মন খারাপ করা ব্যাপার। দিনের আলো নিভে যাচ্ছে, হঠাৎই, অথচ ঘুমুবার আগেই দেখেছিলাম আলোয় ঝলমল করা পৃথিবী, একটা দিনের মৃত্যু ঘটছে, নামছে অন্ধকার, অন্ধকার মানে অনিশ্চয়তা, কী সাংঘাতিক ব্যাপার! শল্যচিকিৎসকের ছুরির নিচে শুয়ে পড়ে যখন চেতনানাশক নেমে আসতে থাকে নাক বরাবর, তখনকার সময়টার মতোই সন্ধ্যা একটা অনিশ্চিত ব্যাপার।

মন খারাপ হয়ে আছে, দমে আছে, সন্ধ্যা মন খারাপের কালি গুলিয়ে খাইয়ে দিচ্ছে পৃথিবীকে, তারই মধ্যে অপার্থিব সৌন্দর্যসম্ভার নিয়ে একটা মেয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে একের পর এক এঁদো গলি, পুরোনো বইয়ের গন্ধভরা, তারপর রহস্যময় খালি দোকান কতগুলো, সেসব পেরিয়ে গেলে নোংরা নোংরা মানুষের বসতি, আর কোনো এক গলির অন্ধকার কোণে তাকে দেখামাত্রই চলে আসে একজন লোক; তার বগলে ক্রাচ, সে তার চাদরের ভেতর থেকে বের করে

আনে খবরের কাগজে মোড়ানো একটা কিছু, আমার বুঝতে ভুল হয় না যে ওগুলো ফেনসিডিলের বোতল। দুটো বা তিনটা।

কত?

লোকটার গলার স্বর ভাঙা, ফ্যাসফেসে গলায় সে বলে, চার শ বিশ।

তাইলে দুইটা দেন। রঞ্জু বলে।

নেন না। পরে তো আইবেনই। এখন কত আছে দেন না।

তিন শ আছে। রঞ্জু বলে।

দেন না। ভাইজানকে তো এর আগে দেখি নাই। নতুন?

না, উনি আমার সাথে আসছে আর-কি।

স্লামালেকুম ভাইজান।

(তোর দাঁত কটা যদি চড়িয়ে আমি খুলে ফেলতে পারতাম! আবার সালাম দেয়! স্পর্ধা কত!)

লোকটা অদৃশ্য হয়ে যায়।

আমার শরীর হিম হয়ে আসছে। আমার অস্তিত্ব বরফ হতে চলেছে। আমার দুনিয়া টলছে। এ আমি কোন অন্ধকার গলির ভেতরে কোন অজানি স্থানের নাজানি সময়সন্ধিক্ষণে এসে পড়েছি! এ কোন গহ্বর, কোন সুড়ঙ্গ, যার অন্য পারে কোনো আলো নেই, আলো নেই, এক মায়াবিনী তঞ্চকের হাত ধরে কোথায় এসেছি...

আর সে দক্ষ অতি, অতিশয়, খপ করে বোতল বের করে ছিপি খুলে...কী আশ্চর্য দক্ষতায় সেই নারী, সে ছিল কিনা পৃথিবীর সুন্দরীতমা, এখন কী রকম কুৎসিত, কী বীভৎস, হায়... আর কী দুর্গন্ধ এই পৌষের উত্তুরে বাতাসে ছড়িয়ে সমস্ত পৃথিবীকে বিবমিষাময় করে তোলে...

পরপর দুই শিশি, তারপর তার কণ্ঠে সন্ধির প্রস্তাব, চলো, এবার কোথাও বসে একটু চা খাই...



অনঙ্গ বউ, অনঙ্গ বউ, একজোড়া হাঁস,/একজোড়া চোখ, কোথায়? তুমি কোথায়? (নির্মলেন্দু গুণ)

কোথায় আবার?

বাকুশা মার্কেটের পেছনের ইঁদুরচরা গলিতে!

তাহলে বুঝে নাও হে বন্ধু, হে অন্তরতর, আমি কী রকম আছি।

আমি কোন সোনার হরিণের পেছন পেছন ছুটতে ছুটতে শাপভ্রষ্ট শিকারির মতো এক ভয়ঙ্কর শ্বাপৎসংকুল কুহকী অরণ্যে এসে পথ খুঁজে মরছি।

কিন্তু আমি এখানে এসেছি স্বেচ্ছায়, এক ডোরাকাটা বাঘিনীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তার হাঁ-মুখের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছি, আর কেউ আমাকে তা করতে বলেনি, যদিও সে বাঘিনী শুধু একবারই আমাকে ডেকেছিল।

এখন বাঘিনীর দোষ দিয়ে লাভ আছে!

আর আমি জানি, লড়ার মতো করে লড়তে জানলে অজেয় কিছু নেই।

কিছুই নেই এ জগতে, যা ভালোবাসা দিয়ে জয় করা যায় না।

আমিও প্রেম দিয়ে, শুশ্রূষা দিয়ে, আত্মত্যাগ দিয়ে, নিবেদিতপ্রাণ সাধনা দিয়ে তার এই অসুখটা জয় করে নেব। ঠিক আছে, এত দিন ধরে সে এই ভয়াবহ মাদকটা, প্রকারান্তরে যা বিষ, বিষের চেয়েও মারাত্মক, খেয়ে আসছে; আজকে এক বেলা অতিরিক্ত খেলেই তো সে মরবে না। কাল থেকে শুরু হবে তার আর আমার যৌথ সংগ্রাম। ভয়াবহ নেশার সংক্রম থেকে সুন্দরকে বাঁচিয়ে তোলার সংগ্রাম।

আমরা ওই রাতে আর নিতাইদার বাসায় যাই না। রঞ্জুর জিনিসপাতি আনবার জন্য রন্টুর বাসায় গেলে রন্টু আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করে।

আমি বলি, এই পাগল, কী করো, এই পাগল!

রন্টু বলে, মিঠু মামা, আমি জানি, আপনার পক্ষেই কেবল সম্ভব ছিল এই

রকম একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া। আর কেউ পারত না। আর কেউ পারত না। আমি ভাই হইয়াই এই চাপ নিতে পারতেছিলাম না, আর কেউ কেমন করে পারবে। আপনি বলে পারলেন, আপনি বলে...

আমি বলি, রন্টু, রঞ্জু নিচে বসে আছে, রিকশায়; আমি যাই।

রঞ্জুকে নিয়া আসি। কার বাসায় গিয়া আবার উঠবেন। এইখানেই থাকেন।

আমরা সেই রাত রন্টুর বাসায় কাটাই। আরও কয়েক রাত। তারপর নিজে একটা বাসা ভাড়া নিয়ে আজিমপুর চায়না বিল্ডিংয়ের গলিবাসী হই।

আমাদের নতুন বাসাটা? সুন্দর।

ছোট্ট বাসা, এক বেড, একটা ড্রয়িংরুম, একটা রান্নাঘর, একটুখানি ডাইনিং পরিসর।

আমরা দুজন সেই বাসাটা সাজানোর জন্য লেগে পড়ি। গুলশানে আসবাবের দোকান থেকে কিনে আনি পুরোনো কিন্তু নতুনের মতো দেখতে চমৎকার ডাইনিং টেবিল, খাট, একটা আলমারি। বাইরের ঘরটাতে বিছিয়ে দিই কার্পেট আর তার ওপর আড়ং থেকে কিনে আনা কুশন।

পর্দা কিনতে হয়, নীলক্ষেত তো কাছেই। পর্দা ছাড়া নববিবাহিতরা দিন কাটাবে কী করে! রাত কাটাবে কী করে!

খুব যে বেশি রাত জাগতে হয়, তাও না। কারণ, রঞ্জুর রক্তে-মাংসে কোনো উত্তেজনা নেই, সে বলে যে অনুভব করে না।

আমি এটা জানতাম। দু-চারটা লেখা-প্রবন্ধ-নিবন্ধে আমিও পড়েছি যে মাদকাসক্তরা শারীরিক সম্পর্কগুলো ঠিকভাবে স্থাপন করতে পারে না।

কিন্তু শরীরের ভাটা আমরা পুষিয়ে নিতে পারি ভালোবাসার জোয়ারে। মন যদি মনকে টানে, তাহলে সবই সম্ভব।

সত্যি বলতে কি, প্রথম কয়েকটা দিন আমি ছিলাম ভালোবাসায় বুঁদ আর রঞ্জুও তাতে সাড়া দিয়ে আনন্দ পাচ্ছিল। আমরা পরস্পরের প্রতি পরিপূর্ণ অধিকারবোধের স্বাধীনতা আর বৈধতাটা অনুভব করতাম মর্মে মর্মে। দিনগুলো যাচ্ছিল তাই মসৃণভাবেই।

সেই সময়ই আমি তার মাথার চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলি, আচ্ছা সু, বলো তো, তোমাকে এই নেশার জগৎটাতে আনল কে?

আরে, কে আবার আনবে। আস্তে আস্তে হয়ে গেল।

না, মানে, প্রথম তুমি কী খাইলা?

প্রথম? প্রথম খাইছি মনে হয় মায়ের দুধই হবে।

আরে নেশার জিনিস!

আরে, এই সব আমি মনে করে বসে আছি নাকি!

না, ধরো, তুমি যে সিগারেট খাও, এটা তোমাকে কে ধরাল? আমারটা আমি বলতে পারি।

তোমারটা আগে বলো।

আমি যখন ক্লাস নাইনে পড়ি, তখন ক্লাসের সবাই মিলে পিকনিকে গেছিলাম। তখনই বন্ধুরা সব সিগারেট খাচ্ছে, আমাকে বলল, দে, এক টান দে। দিলাম এক টান। কাশিটাশি দিয়ে অবস্থা খারাপ।

আমাকে ধরাইছে বল্টু চাচা। আমার সমান-বয়সীই তো। দুনিয়ার জিনিস এনে এনে দেখাত। দিত।

জিনিস মানে?

আরে, ছোটবেলায় ধরো একটা ইয়ো ইয়ো পাইল, এনে বলল, দ্যাখ, এইটা নতুন বার হইছে। এই রকম আর-কি!

তো, তিনি সেই রকম সিগারেটও এনে বললেন, দ্যাখ, নতুন বার হইছে। নে, খা?

না, সিগারেট খায় তো সে আগে থেকেই। সিগারেট মানে বিড়িটিড়ি খাইত নিশ্চয়ই। খেতে খেতে হয়তো আমাকে বলল, নে, দে এক টান। তোমার মতো। দিলাম। অনেক সময় বলত, যা তো, রান্নাঘর থেকে আগুন আন। চামচে করে কাঠকয়লা লাল, আনতে আনতে ছাই, সেইটা আনতে হতো। মা রান্নাঘরে না থাকলে বলত, যা, ধরায়া আন। আমি ধরায়া আনতাম। এইভাবে আর-কি।

আচ্ছা আচ্ছা।

শোনো, আমরা না ছোটবেলায় তেজপাতা দিয়া বিড়ি বানায়া খাইতাম। অনেক আগে পাতার বিড়ি ছিল। তোমার মনে আছে?

আছে। শালপাতার বিড়ি মনে হয়, নাকি জানি না! আচ্ছা তারপর বলো, ফেনসিডিল ধরলা কীভাবে।

ওই তো, নাগেশ্বরীতেই। আমার খুব কাশি। খু-ব কাশি। তখন বল্টু চাচা এসে বলল, কাশির ওষুধ আমার কাছে আছে। খা। ফেনসিডিল এনে দিল। বলল, সকালে খাবি চার চামচ, দুপুরে চার চামচ, রাতে চার চামচ। আমি খেতাম। তো, কাশি কমল। ঘুমও হয়। তারপর যখন তার সামনে আবার কাশি

দিচ্ছি, বলল, নে, এই বোতলটা একবারে খেয়ে ফ্যাল। খেলাম। খাওয়ার পর বলল, এইবার খেতে হবে অনেক চিনি দিয়ে চা। গরম চা। খেলাম। তারপর ঝিমুনি লাগল। সে আমার চুল নেড়ে দিতে লাগল।

শুধু চুল?

না-গো, না। শুধু চুল না। এইটাও।

তুমি অ্যালাও করলা?

আরে, আমার তখন কোনো হুঁশ আছে নাকি! আমি টাল না!

মজা পেয়ে গেলা?

রাইট। মজা পেয়ে গেলাম। প্রায়ই আনে। প্রায়ই খাওয়ায়। ব্যস, নেশা হয়ে গেল।

তারপর যখন খেতে ইচ্ছা করত, কী করতা?

বল্টু চাচাকে চুমু খেতে দিতাম। এই সব আর-কি। বাদ দাও। আর টাকা-পয়সা দিতাম।

তোমার নামে নাকি পোস্টার পড়েছিল?

আরে, বাজে ছেলেদের কাজ। আমি তো সবার সাথে মিশতাম না। যাদের সাথে মিশতাম, তারা খুশি ছিল; যাদের সাথে মিশতাম না, তারা পোস্টার লাগাল।

তোমার এত ছেলের সাথে মিশতে হতো কেন?

নেশার জন্য। মাল পাইতে হবে না! একটু হেসে কথা বললেই তো কেউ এনে দিত।

ও, আচ্ছা!

শোনো, তুমি কিন্তু রেগে যাচ্ছ। তুমি কিন্তু রেগে যেতে পারবা না। আমি যে খারাপ, এইটা তো তুমি জানোই। জেনেশুনেই তুমি আমাকে বিয়ে করছ। এখন তো বলতে পারবা না, তুমি খারাপ কেন?

না, তা বলব না। কিন্তু আমি তোমাকে বিয়ে করছি তোমাকে সুস্থ করব বলে। তুমি আমার সাথে ডাক্তারের কাছে যাবো।

যাব।

আগে তো বলতা, না, আমি নেশাটেশা করি না। এখন তো স্বীকার করছ। ব্যস। এইটা নেশা থেকে মুক্ত হওয়ার এক নম্বর রাস্তা। এখন তোমাকে ডিসিশন নিতে হবে, তুমি নেশা করবা না। ব্যস। তাহলেই অনেকটা কাজ হয়ে যাবে।

হুম।

হুম কী? তুমি বলো, তুমি নেশা ছাড়বা। তুমি সুস্থ হয়ে উঠবা। আমরা একটা বাবু নিব। গুণদার লাইন আছে, আমার খুব প্রিয় : *সংসার মানে অনাগত শিশু, পুতুলে সাজানো ঘর,/সংসার মানে মনোহর নেশা, ঈশানে-বিষাণে ঝড়।* বুঝলা তো কথাটা? তখন সংসার নিজেই নেশা হয়ে উঠবে। সেই নেশাটা খুব মনোহর। বুঝলা না!

হুঁ।

তাহলে আমরা ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি?

হুঁ।

হুঁ না, বলো যাচ্ছি কি না?

যাচ্ছি।

তুমি নেশা ছাড়বে বলে প্রমিজ করছ?

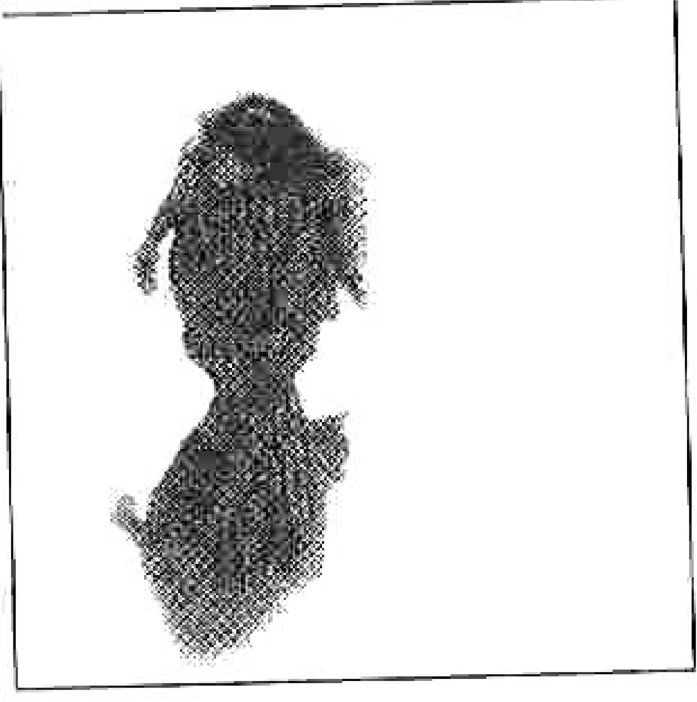
হুঁ।

হুঁ না, বলো প্রমিজ করছি, এবার নেশা ছেড়ে দিব।

হুঁ, প্রমিজ করছি, এবার নেশা ছেড়ে দিব। নাও, হলো তো! আসো। এবার ঘুম পাড়ায়া দাও। আসো।

দিচ্ছি। শোনো। আমি তোমাকে ভালোবাসি, তুমি আমাকে ভালোবাস। আমরা অবশ্যই পারব নেশা ছাড়তে। অবশ্যই।

অবশ্যই।



ডা. ইসরাফিল হকের চেম্বারে যাই। উনি মনোরোগ-বিশেষজ্ঞ। অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়াই ছিল। আমরা যথাসময়ে গিয়ে তাঁর চেম্বারের সামনে দর্শনার্থীদের বসবার ঘরে বসে থাকি। পুরোনো *সানন্দা* পত্রিকা ওল্টাই-পাল্টাই। বাংলাদেশ টেলিভিশনের অনুষ্ঠান দেখি।

দু-একজন আমাকে চিনতে পারে। মিঠু ভাই না! স্ত্রীর সামনে আমার বুকটা খানিকটা প্রশস্ত হয়। দ্যাখো, আমিও কেউকেটা হয়ে উঠছি! লোকে আমাকে বেশ চেনেটেনে। তারপর ডাক আসে।

আমরা তাঁর চেম্বারে ঢুকি।

পেশেন্ট কে? উনি বলেন, মাথাভরা টাক (মানে পকেটভরা টাকা?), গোলগাল মুখ, একদম ডাক্তারের মতো চেহারা। তিনি পরে আছেন একটা লালচে জংলা ছাপার শার্ট।

ও আমার স্ত্রী। স্ত্রী কথাটা বেশ জোরের সঙ্গে বলি।

আচ্ছা, নাম কী? উনি প্রেসক্রিপশন লেখার কাগজ হাতে নেন।

সুরঞ্জনা চৌধুরী। আমি বলি।

উনি কথা বলতে পারেন না? ডাক্তার হাসেন।

পারেন। আমি বলি।

তাহলে ওনাকেই বলতে দ্যান।

জি আচ্ছা। আমি সম্মতি জানাই।

আপনার নাম সুরঞ্জনা চৌধুরী?

জি।

বয়স?

২২।

আচ্ছা, সমস্যা কী, বলেন।

রঞ্জু চুপ করে থাকে।

বলেন, সমস্যা কী?

রঞ্জু মাথা নাড়ে। তার কোনো সমস্যা নেই।

সমস্যা নাই?

সে আবার মাথা এপাশ-ওপাশ করে। মানে, নেই।

এবার ডাক্তার বলেন, জি, আপনি বলেন।

ও আসলে, বুঝলেন না, খারাপ সঙ্গে পড়ে নেশাটেশা করে আর-কি!

উম, কী খায়?

বলো, কী কী খাও, বলো। তোমাকে বলতে হবে।

রঞ্জু বলে না।

ডাক্তার বলেন, আমার মনে হয়, আপনি যান, উনিই থাকুন। আপনার সামনে হয়তো বলতে চাইছেন না।

আচ্ছা, আমি কিছু কিছু জানি, বলি। ফেনসিডিল খায়।

আচ্ছা, ঠিক আছে। একটা জানা গেল। আমার মনে হয়, আমি ওনার কাছেই শুনি।

আমি উঠে বাইরে চলে আসি। *সানন্দা* পড়ি। 'কানে কানে'। বিয়ের পরই বুঝি, আমার স্বামী পুরুষত্বহীন। এরই মধ্যে বাসায় ওর এক মাসতুতো ভাই এসে ওঠে। আইআইটির ছাত্র। এখন আমি গর্ভবতী। ও টের পেয়ে বলেছে, বাচ্চা রেখে দিতে। কী করব? ভবিষ্যতে তো যেকোনো পুরুষই আমাকে ব্ল্যাকমেইল করতে পারে? তখন?

জটিল সমস্যা। এই জগৎটাই তো দেখা যাচ্ছে সমস্যার আকর!

এই পত্রলেখিকার সমস্যার সমাধান কী দেওয়া উচিত? সে কি অ্যাবরশন করাবে? একটা সম্ভাবনার মৃত্যু ঘটাবে? আবার কলকাতার সমাজ কি এ ধরনের একটা শিশুকে মেনে নিতে পারবে? তার জীবনটাকে স্বাধীন ও সুস্থভাবে বেড়ে উঠতে দেবে?

আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারি না।

তার বদলে আরেকটা *সানন্দায়* শাশুড়ি ভার্সাস বউ, 'তু তু ম্যায় ম্যায়'তে চোখ রাখি। সেই দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। নাকি দুই চিরসখী। নাকি একই ঈর্ষার দুই পিঙ্গল চোখ।...শাশুড়ি বড্ড খিটখিটে? পান থেকে চুন খসলে বাড়ি মাথায় করছেন!

বেল বাজে। দরজার সামনে দাঁড়ানো সহকারী উঁকি দিয়ে ফিরে এসে

বলেন, আমার চোখের দিকে চোখ রেখেই, পেশেন্টের হাজব্যান্ড কে?

ভয় হয়, যদি সবাই একসঙ্গে হাত তুলে বসে। সুন্দরীতমার স্বামী পদপ্রার্থীর সংখ্যা নিশ্চয়ই অনেক হবে।

না, আমি ছাড়া আর কেউ ওঠে না। আমি ভেতরে প্রবেশ করি।

ডাক্তারসাহেব বলেন, আপনাদের বিয়ে হয়েছে কত দিন?

নয়-দশ দিন। আমি বলি।

আপনার স্ত্রী আমাকে সব বলেছেন। উনি ফেনসিডিল খান। গাঁজারও হিস্ট্রি আছে। আমি কিছু টেস্ট দিচ্ছি। প্যাথলজিক্যাল টেস্ট। এগুলো করান। শোনেন, ড্রাগস ছাড়তে হলে প্রথমে দরকার সেল্‌ফ বিলিফ, সেল্‌ফ ডিটারমিনেশন। তারপর দরকার ফ্যামিলি সাপোর্ট।

আমি বলি, ওইটাই সে এত দিন পায় নাই।

এখন সেটা আপনাকে দিতে হবে। ওকে ভালোবাসা দিতে হবে। সাপোর্ট দিতে হবে। আপনাকে সিমপ্যাথি দেখালে চলবে না; আপনাকে ইমপ্যাথি দেখাতে হবে, বুঝলেন!

আমি শূন্যচোখে তাকাই। সিমপ্যাথি আর ইমপ্যাথির মধ্যে পার্থক্য কী! এইটা ডিকশনারিতে দেখতে হবে। আমি খুবই সিরিয়াস। পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর মেয়েটি এখন আমারই স্ত্রী, সে এখন পৃথিবীর সবচেয়ে নাজুক মেয়েও, তাকে আবার সোজা পায়ে, শক্ত পায়ে দাঁড় করানোর দায়িত্বটা আমার।

ডাক্তারসাহেব বলেন, কিছু ওষুধও দিয়ে দিচ্ছি। ঘুম পাবে একটু। কাজ কী আর! ঘুমাক!

তাই তো, কাজ আর কী! ঘুমাক।

ডাক্তারের কাছ থেকে বের হয়ে যাই প্যাথলজিক্যাল ক্লিনিকে। পরীক্ষার জন্য নমুনা দিতে। রঞ্জু বেশ লক্ষ্মী মেয়ের মতোই সহযোগিতা করে।

এখন আমি একটা আশ্চর্য জিনিস আবিষ্কার করি।

আমার চারদিকে সব পরিবারেই প্রায় এই সমস্যা। প্রায় সব পরিবারেই।

একবার আমি অ্যানালফিশার অপারেশন করিয়েছিলাম। তারপর কিছুদিন কাজ নেই। বাসায় বিছানায় শুয়ে-বসে বিশ্রাম নিতে হবে। তখন ডিভিডি প্লেয়ার ধার করে এনে ছবি দেখতে শুরু করি। একটা ছবি আনি, তার নাম *চিলড্রেন অব টাইম।* ছবির শুরুতেই একটা কালো মহিলা তার প্রয়াত স্বামীর সঙ্গে গজরগজর করছে; বলছে : শোনো, তোমার কি পাইল্‌স ছিল না? জগতের মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত—যাদের পাইল্‌স আছে, আর যাদের পাইল্‌স নাই।

এখন মনে হচ্ছে, বাংলাদেশের পরিবারগুলো দুই ভাগে বিভক্ত—যে পরিবারে মাদকের সমস্যা আছে, আর যে পরিবারে মাদকের সমস্যা নেই। আমার মনে হচ্ছে, মাদকের সমস্যা আছে, এই রকম পরিবারের সংখ্যাই বেশি।

কী ভয়ালভাবে এই সমস্যা সমস্ত বাংলাদেশকে পঙ্গু, অথর্ব, অকর্মণ্য, সম্ভাবনাহীন করে তুলছে! আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেক পাগল, উন্মাদ, কর্মহীন, ভারসাম্যহীন, অসুস্থ, অসৎ, প্রতারক, মিথ্যাবাদী, তশকর হয়ে ধীরে ধীরে পা রাখছে মৃত্যুগহ্বরের দিকে, আর বাকি অর্ধেক পাগল হয়ে উঠছে তাদের নিয়ে; তাদের বোঝা তারা না-পারছে ফেলে দিতে, না-পারছে গ্রহণ করতে।

এখন আমার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, শিক্ষক-চিকিৎসক, পাড়া-প্রতিবেশী—সব পরিবারেই আবিষ্কার করছি এই একটাই সমস্যা। মাদকের সমস্যা। একেকজন একেকটা মাদক নিচ্ছে। কেউ খাচ্ছে গাঁজা, কেউ হেরোইন, কেউ মরফিন নিচ্ছে, কেউ ফেনসিডিল খেয়ে ঝাঁঝরা করে ফেলছে শরীর আর ভবিষ্যৎ; আরও কত কত ড্রাগ যে আসছে এই দেশে!

সবচেয়ে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছে ফেনসিডিল। আর তার ক্ষতিকর প্রভাবও আক্রান্তদের শরীরে পড়ছে বেশি। হেরোইন নেওয়া মানে তো মৃত্যুই, ওই ঝামেলা বেশি দিন পোহানোর দরকার পড়ে না; কিন্তু ফেনসিডিল আপাতত নিরীহ হলেও এর ধ্বংসকারী ক্ষমতা ভয়াবহ। সবকিছুই নষ্ট করে সে। শরীরের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তন্ত্র পোকায় কাটা ফলের মতো নষ্ট করে ফেলে হেরোইন। আসক্তের ঘুমের নিয়ম নষ্ট হয়ে যায়; কিডনি, লিভার পচতে থাকে; যৌনক্ষমতা, প্রজননক্ষমতার বারোটা বাজে, আর সবচেয়ে ভয়ঙ্করভাবে নষ্ট হয় মাথা, মস্তিষ্কের কোষ-অণুকোষ। পাগল হয়ে যায় ফেনসিডিলখোরেরা, পাগলামোর চূড়ান্ত করে একেকজন। আর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর লাগে তখন, যখন এরা ভোগে বেরোয়—নেশার তৃষ্ণায় ছটফট করছে, কিন্তু নেশা জোগাড় করতে পারছে না; শরীর বেঁকে যায়, চোখ-মুখ ছিটকে বেরিয়ে আসতে চায়, গোঁ গোঁ করে, মাটিতে গড়িয়ে কাটা মুরগির মতো তড়পায়। সেই দৃশ্য কোনো মানুষের পক্ষে সহ্য করা মুশকিল। ওই সময় ওদের দিয়ে করিয়ে নেওয়া যাবে না, এমন কোনো কাজ নেই।

এই সমস্ত পড়ি। এই সমস্ত জানি এখন। শুনি নানাজনের কাছ থেকে। বুঝি, সুখে থাকতে মানুষকে কীভাবে ভূতে কিলায়। কী দরকার বাবা এই অসহ্য কষ্টের যন্ত্রণার অবমাননার আর অন্যদের জীবনকে তছনছ করে তুলবার পথে পা বাড়াবার?

একটা সমস্যা হলো পিয়ার প্রেশার। বন্ধুদের চাপ। নে দোস্ত, খা না, খাইলে ফিলিংস আইব, জোশ লাগব...

ওই বন্ধুকে 'না' করলে সে হাসে, তার বন্ধুরা টিটকারি মারে।

ওই সময় 'না' করতে পারার নামই স্মার্টনেস। ওর নামই পুরুষকার। ওইটাই আধুনিকতা।

একটা কারণ মাদকের সহজলভ্যতা। সরকার আসে, সরকার যায়; মাদকের সহজলভ্যতা কেউ দূর করে না। শুধু ভদ্র গোছের পানীয় উৎপাদনের লাইসেন্স দেওয়া হলেই হইচই শোনা যায়। তারা কেন ফেনসিডিলের বিরুদ্ধে হইচই করে না, কেন হইচই করে না ক্ষতিকর ড্রাগসের সহজপ্রাপ্যতা নিয়ে? এ এক রহস্যই বটে।

হ্যাঁ, বেকারত্ব, হতাশা, পারিবারিক অশান্তি, প্রেমে ব্যর্থতা—এসব সব মানুষের জীবনেই কখনো না কখনো আসে। তাই বলে তো সব মানুষই ড্রাগস নিচ্ছে না। বহু বড়লোকের ছেলেমেয়ে ড্রাগস নিচ্ছে শখ করে। বহু গরিব রিকশাওয়ালা ড্রাগস নিচ্ছে এই চক্রের জালে পড়ে, আর বেরোতে পারছে না।

সমাজে অপরাধ বাড়ছে, চুরি-ছিনতাই-রাহাজানি বাড়ছে। অন্যদিকে বড় বড় মাদক-ব্যবসায়ী আছে এই দেশে। ছয় হাজার কোটি টাকার মাদক-ব্যবসা হয় এই দেশে প্রতিবছর! তাহলে তার সঙ্গে নাজানি কোন বড় ব্যবসায়ী জড়িত!

যতই খোঁজ নিই, যতই পড়ি, যতই সেমিনারে-গোলটেবিলে যাই; ততই মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় এই সব তথ্য জেনে।

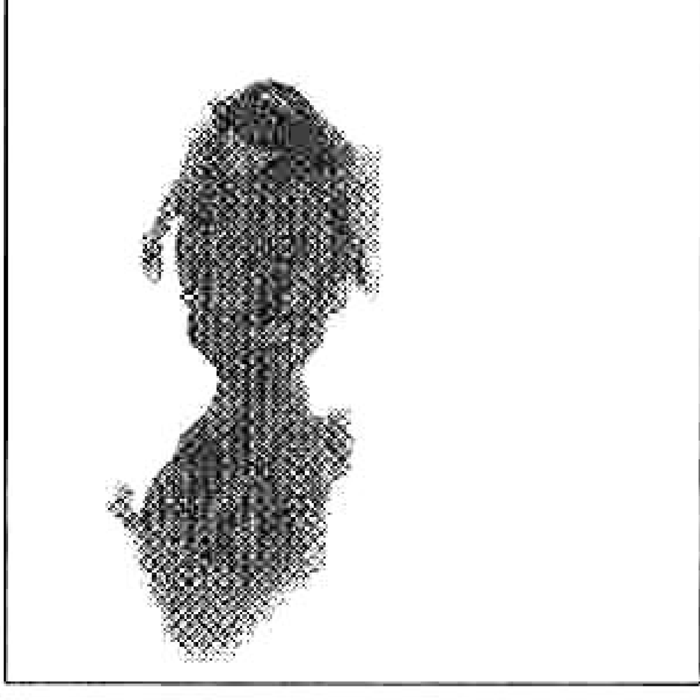
কিন্তু পুরো জাতিকে ড্রাগসের ভয়াবহ মহামারি থেকে বাঁচানো নয়, আমার সংগ্রাম খুবই ছোট্ট, খুবই এককেন্দ্রিক, লক্ষ্যনির্দিষ্ট।

এই দুনিয়ার সুন্দরীতমাটিকে মাদকের হাত থেকে বাঁচানো।

তার চিকিৎসা চলছে। প্যাথলজিক্যাল রিপোর্টে দেখা গেছে, তার রক্তে নেশার বিষ বহু দূর ঢুকে গেছে, সহজেই ফিরবে না সে। আপাতত সে ছাড়তে পারে, কিন্তু রক্তে নেশার বীজ থেকে যাবে আরও বহুদিন। সেই বিষ ক্ষয় না হওয়া পর্যন্ত সে ঝুঁকির মধ্যেই থেকে যাবে।

তাকে ডাক্তার ওষুধ দিয়েছেন। সে খায় আর ঘুমায়। এই ওষুধ খেলে তার নেশা গ্রহণের ইচ্ছা যাবে কমে।

তারপর না-খেতে না-খেতে, শরীরের ভেতর থেকে বিষ কমে যেতে যেতে একসময় সে সুস্থ হয়ে উঠবে।



ডাক্তার বললেন, উনি যেন বসে না থাকেন। অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। তাকে কাজ দিন। রঞ্জুকে বললেন, দেখুন, শুধু যে ড্রাগস নিয়েই নেশা করা যায়, তা কিন্তু না; আপনি ভালো কাজেও নেশা করতে পারেন; আপনি মিউজিকের নেশা করুন, ক্রিকেটে নেশা করুন, রান্নাবান্নায় নেশা করুন, সমাজসেবার নেশা করুন। কত কি আছে মাতামাতি করবার!

আস্তে আস্তে তার উন্নতি হচ্ছে। তাকে নিয়ে যাই ভর্তি করাতে। ইডেনে চেষ্টা করি, বদরুন্নেসায় চেষ্টা করি, লালমাটিয়ায়ও। না, কোনোখানেই ভর্তি করানো যাবে না। শুধু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে তাকে ভর্তি করানো যাবে। বেশ, তা-ই হোক।

তাকে নিয়ে যাই ইকেবানার ক্লাসে। জাপানিরা কী সামান্য ফুল আর পাতা দিয়ে হাতের সামান্য ছোঁয়ায় অসামান্য করে তোলে ফুল-পাতার বিন্যাসটিকে!

ও সপ্তাহে এক দিন ইকেবানার ক্লাস করতে যায়।

রান্নাবান্না আমিও করি, মাঝেমধ্যে রঞ্জুও করে। আমার স্পেশালিটি ডিম আর খিচুড়ি। ব্যাচেলর-জীবনে এ বিষয়ে আমি বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছি। ও ভালো রাঁধে মুরগির ঝোল। অপূর্ব হয়!

আমাদের খেলা-খেলা সংসার জমেই ওঠে।

আমার শখ হয়, আমি রবীন্দ্রসংগীত শিখব। বাসায় গানের শিক্ষক রেখে দিই মাসিক চুক্তিতে।

হারমোনিয়াম-তবলা কিনে আনি। হেঁড়ে গলায় গান ধরি। আমার গান শুনে রবীন্দ্রনাথের আত্মা পুরো পূর্ব বাংলা থেকে চলে যান। আর কখনো আসবেন না বলে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন বলে আমার বিশ্বাস। তবু শিক্ষক আর আমি কেউই হাল ছাড়ি না। বসবার সময় রঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে বসি।

টাকা-পয়সা কিছু খরচ হচ্ছে, হোক। তবু রঞ্জু পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠুক।

সারাটা পৃথিবীর সঙ্গে, রন্টুর সঙ্গে এ যে আমার বাজি। এতে তো আমার হারলে চলবে না!

ও ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে। শুধু একটাই সমস্যা—ও বেজায় সিগারেট খায়। সারাক্ষণ।

সিগারেটকে মাদকের মধ্যে ফেলা না হলেও বলা হয়ে থাকে, ধূমপান হচ্ছে মাদকের প্রবেশপথ। ধূমপায়ীদের পক্ষে নেশা ধরা খুবই সহজ। যে ধূমপান করে না, সাধারণত সে নেশাও করে না। অন্যদিকে ধূমপানের ক্ষতিও অসীম। ক্যান্সার থেকে শুরু করে এমন কোনো রোগ নেই, যা ধূমপান থেকে হতে পারে না।

আমি ঠিক করি, আমি সিগারেট ছেড়ে দেব।

আমি রঞ্জুকে ছুঁয়ে বলি, এই দেখো সু, আমি ঠিক করেছি, সিগারেট ছেড়ে দেব, তোমার অনারে। যাতে আমি বুঝতে পারি, একটা নেশা ছাড়া কত কঠিন! কত কষ্ট!

ও খুশি হয়। বলে, ঠিক আছে, ছাড়ো। তুমি ছাড়তে পারলে আমিও ছাড়ব।

বাপ রে! সিগারেট ছাড়াও ভীষণ কঠিন। কারণ ওই একই। নিকোটিন ঢুকে গেছে রক্তের কণায় কণায়, সে ছাড়তে দিতে চায় না তামাককে।

কিন্তু আমি যে আমার প্রিয়তম মানুষটিকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি! আমি ছাড়বই। ছাড়তে আমাকে হবেই। ধূপমান ছাড়ার উপায় হলো শেষ সিগারেটটা না খাওয়া। এই উপদেশ মেনে চলি আমি। সেই বলেছি আর খাব না; ব্যস, আর খাই না আমি। খাব না তো খাবই না।

রঞ্জু অবশ্য ধূমপান ছাড়তে পারে না। সে বলে, আগে একটা ভালোমতো ছেড়ে দেই। তারপর আরেকটা হবে।

আচ্ছা, তা-ই হোক।

আমি ওকে নিয়ে যাই আমার রেকর্ডিং স্টুডিওতে।

সবাই বলে, আরে, ভাবিকে আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট বানান না! দারুণ হবে তাহলে অনুষ্ঠানটি।

আমি বলি, করবা নাকি?

ও মাথা নাড়ে। ও করতে চায় না।

আচ্ছা, কোরো না। আসলে রঞ্জনা কারও অ্যাসিস্ট্যান্ট হবে না। ও একেবারে নিজের অনুষ্ঠানই করবে। আমি বলি আর খ্যাকখ্যাক করে হাসি।

ডাক্তারের কাছে রঞ্জুকে নিয়ে যাই নিয়ম করে। ডাক্তার একটা কথাই বলেন, পেশেন্টকে মোটিভেটেড হতে হবে যে এটা আমি ছাড়ব। এটা আমাকে কষ্ট দেয়। আমার মৃত্যু ডেকে আনে। আমার সামাজিক সম্মান বলতে আর কিছু থাকে না। আমি মিথ্যা কথা বলি। চুরি করি। আমি আসলে শেষ হয়ে যাই। কিন্তু আমি আমার একাকে শেষ করি না, সঙ্গে সঙ্গে পুরো ফ্যামিলিটাকে শেষ করে দেই। আমার জন্য আমার ফ্যামিলিটাও কিন্তু প্যাসিভ অ্যাডিকশনে ভোগে। যেমন অ্যাডিক্টেডরা মিথ্যা কথা বলে, খুব অবলীলায় বলে। খুব বিশ্বাসযোগ্যভাবে মিথ্যা কথা বলে। এখন ওর ফ্যামিলি কী করে—ও যখন বলে, টাকা দাও; ফ্যামিলির লোকেরা বলে, টাকা নাই। অর্থাৎ যে অ্যাডিক্টেড না, সেও মিথ্যা বলল। এইটা একটা ছোট উদাহরণ দিলাম। বড় উদাহরণ হলো, বহু গার্জিয়ান টেনশনে অসুস্থ হয়ে পড়েন। খরচ সামলাতে না পেরে একেবারে তছনছ হয়ে যান। মারামারি, ডিভোর্স, সন্তানদের জীবন নষ্ট, মা-বাবার মৃত্যু—কত কি যে ঘটে! এখন যদি সব লস যোগ করি, তাহলে এটা জাতির জন্য একটা বিশাল ক্ষতি। অপূরণীয় ক্ষতি। কিন্তু সারার উপায় কী? যে অ্যাডিক্টেড, তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে—না, এটা খারাপ। আমি ছাড়ব। মোটিভেটেড হতে হবে। কনভিন্সড হতে হবে। মনকে শক্ত করতে হবে। কয়েকটা দিন উইথড্রাল সিম্পটম কিছু হবে। পেট ব্যথা করতে পারে, সর্দি হতে পারে, সারাক্ষণ নাক দিয়ে পানি পড়তে পারে। নানা কিছুই হতে পারে। তারপর কিন্তু সব ঠিক হয়ে আসে। তারপর হয় কী? মনের সঙ্গে যুদ্ধ। অনেক ক্ষেত্রে এই রকমও হয়েছে—ঘুমের মধ্যে আমরা যেমন গা চুলকাই, তেমনই কেউ কেউ নিজের অজান্তেই গিয়ে হাজির হয় ড্রাগসের আসরে। এ জন্য তাকে অকুপায়েড রাখতে হবে।

ডাক্তারের কথা শুনে সে নিজেই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারে বলে মনে হয়। সে সেরে উঠবে, এ ব্যাপারে আমি বেশ প্রত্যয়ী হয়ে উঠি।

আমি রন্টুকে ফোন করে বলি, রন্টু, বলেছিলাম না, হবে! দ্যাখো, হচ্ছে। ও অনেক কোঅপারেশন করছে। করবে না কেন, আমি তাকে ভালোবাসা দিচ্ছি! সে বুঝতে পারছে, তার জীবনটা মূল্যবান। একজনের কাছে অন্তত তার দাম আছে। সেই ভালোবাসাটাই তো সে এত দিন পায় নাই।

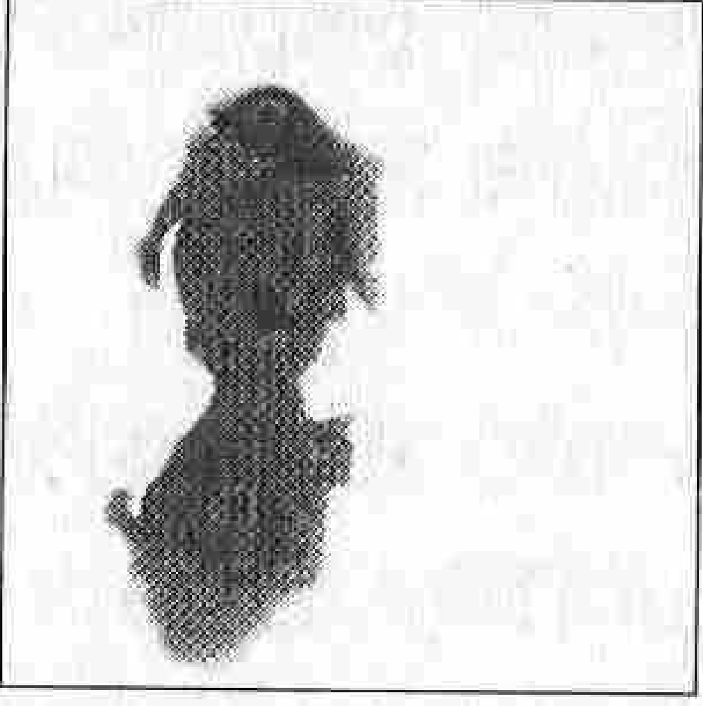
রন্টু রেগে যায়, মিঠু মামা, বললেন একটা কথা! ভালোবাসা পাবে না কেন! আমরা তাকে কম ভালোবাসতাম! বাবা ওকে কম ভালোবাসত! মা ওর জন্য...ও কী ফুটফুটে একটা মেয়ে ছিল...আমরা পিঠাপিঠি, ওর সঙ্গে আমার

কত মধুর মধুর স্মৃতি...কী করি নাই আমি ওর জন্য! কোন চেষ্টাটা বাকি রাখছি আমরা...বাবা তো মারাই গেল...যাক, তবু আপনি যা বলছেন, আপনার ভালোবাসার জন্যই হয়তো সে ওয়েট করতেছিল...এইবার পাইছে...ভালো হয়ে উঠতেছে...ও ভালো হয়ে উঠলে আমার চেয়ে কেউ বেশি খুশি হবে না মিঠু মামা...

রন্টু একটা অর্বাচীন। শিশুতোষ ওর ধারণা। একজন নারীর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তার দয়িতের প্রেম। ভালোবাসা। এইটাই প্রাকৃতিক। ভাইয়ের বোনের মায়ের বাবার ভালোবাসা নয়, তার দরকার ছিল একজন যত্নশীল প্রেমময় পুরুষ, যে তাকে ছায়া দেবে, সঙ্গ দেবে, প্রশ্রয় দেবে...

আমার সংসারে আনন্দ আর শ্রী ফুটে উঠতে থাকে। বারান্দায় টবে গাছ, দেয়ালে বাঁধানো ছবি যুক্ত হয়। রঞ্জু মাঝেমধ্যে ঘরে সাজিয়ে রাখে ইকেবানা। এত সুন্দর হয় সেই সাজানোটা! আমি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি। এরপর তার শখ হয়, রান্নার ক্লাস করবে। সেই রকম একটা কোর্সেও ভর্তি করে দিই তাকে।

আমার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা হয়, এই দুনিয়ায় আমার চেয়ে সুখী আর কেউ নেই। আমার ঘরে, আমার বাহুবন্ধনে সুন্দরীতমা; আবার আমিই তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি তার স্বাস্থ্য আর সম্মান, সুস্থতা আর নিরাপত্তা, ফিরিয়ে দিচ্ছি তার আত্মমর্যাদা। আমি তাকে সুস্থ করে তুলছি। দ্যাখো, আজ থেকে কোনো গোলাপ আর রুগ্ণ থাকবে না। আমি তারায় তারায় রটিয়ে দেব, তুমি আমার।



আমি যাই টেলিভিশন চ্যানেলের স্টুডিওতে। রেকর্ডিং নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। ক্যামেরা সব সময় থাকে তিনটা। আজকে একটা কম। সেটেও সমস্যা। সামনের চেয়ারগুলো বদলে গেছে। এই সব নিয়ে চিৎকার-চেঁচামেচি করতে হয়।

প্রযোজক জহির উদ্দিনও চিল্লাচিল্লি করেন। যেসব তরুণের আসার কথা, তাদের একজন এসেছে তো আরেকজন আসেনি। অথচ দুজনকে বসাতে হবে একসঙ্গে। বলা আছে, কেউ যেন নীল রঙের কাপড় পরে না আসে; দেখা যাচ্ছে, অনেকক্ষণ পরে যে এল, তার পরনে নীল রঙের শার্ট। এখন অন্য রঙের শার্ট কোথায় পাই! আমার ব্যাগে অতিরিক্ত ফতুয়া আছে, সেটা বের করতে হয়।

বাসায় আজকে আমার মামার আসার কথা। এই মামাটির প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। একাত্তর সালে তিনি আমাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। আমাদের বিশাল পরিবার তাঁর কাঁধে সওয়ার হয়েছিল। আমার বাবা অল্প বয়সে মারা যান। তার পর থেকে তিনিই মাকে নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করে আসছেন। গোপন-প্রকাশ্য নানা রকমের সাহায্য।

তারপর তো আমরা, আমার ভাইবোনেরা আস্তে আস্তে বড় হলাম। এখন নিজেদের দায়িত্ব নিজেরাই নিতে পারি।

মামাকে বলেছি বাসায় চলে আসতে।

মোবাইলে কথা হয়েছে।

বাসায় রঞ্জু আছে, মামা ভাগ্নেবউকে দেখবেন, আশীর্বাদ করবেন। কোনো অসুবিধা নেই। আমি শুটিং সেরে আসব।

আমার মোবাইল ফোন বেজে ওঠে। তাকিয়ে দেখি, মামার কল। অন্য কোনো কল হলে এখনই মোবাইলের পাওয়ার অফ করে ফেলতাম। কিন্তু

মামার কল বলে এই কলটা গ্রহণ করি।

হ্যালো, মামা।

বাবা মিঠু, তোমার বাড়ির ঠিকানা তো ১৫ বাই এ, চায়না বিল্ডিংয়ের গলি, আজিমপুর, তিনতলা। না?

হ্যাঁ, মামা।

বাবা, তোমার বাসার সামনে তো আমি দুইবার আসলাম। এক ঘণ্টা আগেও আসছিলাম। বাবা, ঘরে তো তালা।

কী বলেন! আপনি কি ঠিক বাসায় গেছেন মামা?

ঠিকই তো মনে হয়। বাসার গেটে রবীন্দ্রনাথের একটা ছবি আছে কালোর মধ্যে গমজাতীয় গাছের পাতা দিয়া আঁকা?

জি মামা।

তাইলে তো বাবা, মনে হয়, ঠিক বাসাতেই আসছি।

মামা, আপনি দাঁড়ান একটু। আমি এখনই আসতেছি।

বাবা, এইখানে তো দাঁড়ানোর জায়গাও নাই।

তা নাই। আচ্ছা, আপনি নিচে সিঁড়ির পাশে ওষুধের দোকানটা আছে না, ওইখানে গিয়া আমার কথা বলেন। তাহলেই বসতে দিবে। আমি আসতেছি মামা।

আমি শুটিং ফেলে রেখে টিভি চ্যানেলের গাড়ি ধার নিয়ে ছুটে আসি আজিমপুর। এসে দেখি, তখনো মামা বসে আছেন ওষুধের দোকানে।

মামা আমাকে ফোন করেছেন পৌনে এক ঘণ্টা আগে। তারও আগে মামা এসেছিলেন ঘণ্টাখানেক আগে। সব মিলিয়ে পৌনে দুই ঘণ্টা রঞ্জু বাসায় নেই। তার তো কোথাও যাওয়ার কথা নয়।

আমার মাথা চক্কর দিচ্ছে। এত দিন পর আমাদের সবচেয়ে প্রিয় মামার সঙ্গে দেখা হলো, মামার চেহারা অনেক খারাপ হয়েছে, তিনি ওজন হারিয়েছেন, একটু বেশিই বয়স্ক দেখা যাচ্ছে—এই সব কথা তাঁকে বলব, তা করা হয় না। আমার বুক কাঁপে। মেয়েটা গেল কই?

ওদিকে শুটিং শেষ করে আসিনি। সহকারী মেয়েটাকে বলেছি, কতগুলো সাক্ষাৎকার সে-ই যেন নিয়ে নেয়, আমি ফিরে গিয়ে শুধু কিউ দিয়ে দেব। এখন কোথায় রইল শুটিং, কোথায় রইল মামার আপ্যায়ন, কোথায় রইল মামার ভাগ্নেবউ দর্শন! এখন তো নিজের বউকে খুঁজে ফিরতে হয়। যতবার তার মোবাইলে কল দিই, ততবার বন্ধ পাই। যন্ত্রণা তো!

মামাকে বসিয়ে রেখে আমি নিচে নামি। এপাশ-ওপাশ করি। পথের দিকে তাকাই।

আবার উঠি তিনতলায়।

শেষ পর্যন্ত তিনি আসেন।

কোথায় গেছিলা?

এই তো, একটু বাইরে। ১৫ মিনিট আগে।

১৫ মিনিট! মামা এইখানে এসেছেনই তো আড়াই ঘণ্টা আগে। তখন থেকেই তো তালা।

তাই নাকি! আমাকে একটা কল করলেই পারতা।

তোমার মোবাইলও তো বন্ধ।

বন্ধ নাকি! দ্যাখো তো কী কাণ্ড! কখন অফ হয়ে গেছে টেরই পাই নাই। আরে, ফটোগ্রাফার বাবু ভাই আসছিল। বলল, তার কাগজের জন্য মডেল দরকার। সেই জন্য তার সাথে একটু গেছিলাম। কয়েকটা ছবি তুলল।

তাই নাকি! বাবু কই, আমাকে তো কিছু বলল না।

ও-মা, তোমাকে কী বলবে! ছবি তুলবে আমার। তোমাকে বলতে হবে কেন? তুমি চাও না, আমি ছবি তুলি?

আমি বলি, আমি এক্ষুনি বাবুকে ফোন দিচ্ছি। ওর সাথে তো কালকেও কথা হয়েছে, ও বলতে পারত না আমাকে?

বাবু ভাইকে ফোন দেওয়ার কী আছে, তুমি বিশ্বাস করতে পারছ না আমাকে?

মামা আছেন, তাই এ নিয়ে আর বেশি কিছু বলি না। মামাও ভাগ্নেবউকে একটা গলায় পরবার চেইন উপহার দিয়ে বেশিক্ষণ নাথেকে চলে যান।

আমি সেদিনের মতো শুটিংয়ে যাওয়াও বাতিল করি। আমার মনটা ভীষণ দমে যায়। ভীষণ!

একদিন নিচতলার ওষুধের দোকানে গেছি প্যারাসিটামল ট্যাবলেট কিনব বলে, মাথাটা দারুণ ধরেছে। দোকানি আমাকে বলে, স্যার, ভাবির শরীরটা কি ভালো না, নাকি?

কেন? ভালোই তো আছে এখন।

না, মানে, আমার কাছ থেকে কতগুলো ট্যাবলেট নেয়।

কী ট্যাবলেট?

দোকানি আমাকে একটা ঘুমের ওষুধের নাম বলে।

আমি ঘরে ফিরে যাই। রঞ্জুকে বলি, রঞ্জু, তুমি এই ট্যাবলেট এনেছ?

হ্যাঁ।

কেন এনেছ?

ঘুমের জন্য, আমার ঘুম আসে না।

আমি আবার তাকে নিয়ে যাই ডাক্তার ইসরাফিল হকের কাছে। ডাক্তার সব শুনে বলেন, মা, তুমি কেন ঘুমের ওষুধ খাচ্ছ? তোমার তো আমার প্রেসক্রিপশনের বাইরে কোনো ওষুধ খাওয়ার কথা না।

রঞ্জু চুপ করে থাকে।

মা, প্রশান্ত স্বরে ডাক্তার বলেন, তুমি আমার দেওয়া ওষুধগুলো খাচ্ছ তো?

হ্যাঁ।

দ্যাখো, আমাকে মিথ্যা বলার দরকার নাই। আমাকে তুমি সত্য বলো। আমাকে লুকিয়ে কোনো লাভ নাই। বলো মা, তুমি ঠিকমতো আমার দেওয়া ওষুধগুলো খাচ্ছ তো?

হ্যাঁ, খাচ্ছি।

তোমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো!

ঘুম হতে চায় না। তাই আমি ওই ঘুমের ওষুধ কিনে এনে খেয়েছি।

আর খেয়ো না। আমিই ওষুধ বদলে দিচ্ছি।

ডাক্তার আমাকে বলেন ওর দিকে আরেকটু নজর রাখতে। আরেকটু সময় দিতে। ওকে যেন সব সময় নজরে রাখি।

জানি না, আর কীভাবে আমি তাকে আগলে রাখতে পারব।

রাতের বেলা রঞ্জু ঘুমায় না। বিছানায় উঠে বসে থাকে। ছটফট করে। কোনো দিন সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠে না। কখন যে ও ঘুম থেকে উঠবে তার কোনো স্থিরতা নেই।

আমি ফোন করি বাবুকে, বাবু, রঞ্জুর ছবি কবে ছাপা হবে কাগজে?

ছবি? কাগজ?

তুমি রঞ্জুকে নিয়ে গিয়ে ছবি তুলেছ না তোমার কাগজে ছাপার জন্য?

কই, না তো!

পৃথিবী উল্টে যেতে থাকে। মনে হচ্ছে, আকাশ পায়ের নিচে, মাথার সঙ্গে মাটি। মনে হচ্ছে, ফ্যান ঘুরছে পায়ের তলে, আর ট্যাপের পানি ছুটে যাচ্ছে আকাশে।

রঞ্জু মিথ্যা কথা বলতে শুরু করেছে। খুবই বিশ্বাসযোগ্যভাবে মিথ্যা কথা বলা হলো মাদকাসক্তির একটা লক্ষণ।

আমি আবার কথা বলতে চাই ওর সঙ্গে। বলি, সু, আমি তোমার সাথে আছি। তোমার বেদনা আমারও বেদনা। তোমার আনন্দ আমারও আনন্দ। তুমি আবার ফেনসিডিল খেতে শুরু করেছ?

ও রেগে যায়, না, কক্ষনো না। কেন তুমি আমাকে এই সব কথা জিজ্ঞাস করতেছ? কেন?

বাহ্, আমি তোমাকে জিজ্ঞাস করব না! তুমি আমার সবকিছু না? তোমার যেকোনো দরকারে, তোমার সুসময়ে-দুঃসময়ে আমি তোমার পাশে থাকতে চাই, রঞ্জু।

না, তুমি আসলে একটা মেল সডোমিস্ট। তুমি একটা ভণ্ড। তুমি টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে ভদ্র ভদ্র কথা বলো। আসলে এসব তোমার মুখোশ। তুমি আসলে একটা গ্রাম্য চণ্ডাল। তুমি চাও না মেয়েরা স্বাধীনভাবে চলুক, স্বাধীনভাবে ভাবুক।

রঞ্জু, কিন্তু তুমি আবার ফেনসিডিল খাওয়া শুরু করো—এইটা তো কোনো স্বাধীনতা হতে পারে না।

আমি ফেনসিডিল খাই, কে তোমাকে বলল? না, আমি ফেনসিডিল খাই না।

তাহলে তুমি কী নিচ্ছ, বলো। তোমার চালচলন, কথাবার্তা, না ঘুমানো—সব বলছে, তুমি আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছ। তোমাকে বলতে হবে, তুমি কী খাচ্ছ।

না, আমি একদম ঠিক আছি। আমি কিছুই নিচ্ছি না। কিছুই খাচ্ছি না।

আচ্ছা, চলো তাহলে ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার তোমাকে দেখে বলুক।

চলো।

ডাক্তারের কাছে কিন্তু তাকে নিয়ে যাওয়াটা সহজ হয় না। প্রায় একদম জোর খাটিয়েই তাকে আবার নিয়ে যাই ইসরাফিল হকের সামনে।

তিনি দেখেন। বলেন, মা, আমাকে মিথ্যা বলে তো লাভ নাই। আমি তো তোমার নাড়িতে হাত দিলেই সব বুঝি। তুমি তো আবার শুরু করেছ।

না, করি নাই।

আচ্ছা, শোনো। যেকোনো ড্রাগস আরম্ভ করা সোজা, ছাড়া খুবই কঠিন। ছাড়া সহজ হলে তো সবাই ছাড়তে পারত। কেউ চায় না এই ঘৃণ্য জীবনে বাস

করতে। ছাড়তে চায়, কিন্তু পারে না। সে কারণেই এটাকে আমরা বলি মরণনেশা। ছাড়া খুব কঠিন। সবাই পারে না। কিন্তু অনেকে তো পারেও। কারা পারে? যারা ছাড়তে চায়। তোমাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আমি ছাড়ব।

শারীরিক কষ্ট তো প্রথম কয়েক দিন। তার পরেরটা কিন্তু মানসিক। ওই সময় যদি তুমি তোমার পণ ঠিক রাখ, তাহলেই তুমি পারবা। না হলে পারবা না।

আমি তো আর ড্রাগস নিচ্ছি না, আমাকে এত কথা বলতেছেন কেন? রঞ্জু বলে।

আচ্ছা, তোমার টেস্ট দিচ্ছি। টেস্ট করালেই বোঝা যাবে তুমি নিচ্ছ কি নিচ্ছ না।

হতাশ আমি। ভীষণ হতাশ। আমার ভাইবোনেরা কেউ এ বিয়ে মেনে নেয়নি। মামা এসেছিলেন, সেটাকেই আমি একটা স্বীকৃতি মনে করি। সেই মামা কী দেখে গেলেন বাসায়! এই মেয়ের জন্য আমি কী না করেছি! আর সে আবার উল্টোপথে হাঁটতে শুরু করে দিল!

আবার মিথ্যা কথা বলছে!

ডায়াগনস্টিক সেন্টারে নিয়ে যাই তাকে। রক্তের নমুনা দেওয়া হয়। পেশাবের নমুনা দেওয়ার সময় সে যে ইউরিনের বদলে পানি ভরে দিয়েছে, তা বুঝব কেমন করে! রিপোর্ট নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেছি দুজনই।

ডাক্তার দেখে বলেন, মা, তোমার ব্লাডের রিপোর্টে তো ড্রাগস পাওয়া যাচ্ছে। আর ইউরিনের বদলে তুমি পানি দিয়েছ। এটাও রিপোর্টে এসে গেছে। মা, তুমি কি কাণ্ডটা ঠিক করেছ?

কী! সে নির্বিকার।

এই যে ইউরিন না দিয়ে পানির স্যাম্পল দিলে, এইটা কি ঠিক হলো?

ডাক্তারের দেখা যাচ্ছে অপরিসীম ধৈর্য। তিনি এখনো হাসছেন। রাগে আমার গা চিড়বিড় করছে।

হঠাৎই রঞ্জুর দৃষ্টি পাল্টে যায়। মনে হয়, সে এই জগতের নয়, অন্য কোনো জগতের মেয়ে; আমরা কেউ তাকে চিনি না। সে রাগে ফুঁসতে থাকে।

মা, তুমি সিদ্ধান্ত নাও যে তুমি আর নেবে না।

অনেকক্ষণ পর শান্ত হয় সে। ফিরে আসে তার চোখের পার্থিব দৃষ্টি। বলে, ঠিক আছে, আর নেব না।

আমি কাজ বাদ দিয়ে দিই। সারাক্ষণ তার সঙ্গে থাকি। তাকে এক

পলকের জন্যও নজরছাড়া করি না।

সে খেপে যায়। কী ব্যাপার, তুমি কেন সারাক্ষণ আমাকে পাহারা দিয়ে রাখ!

তাই তো!

আমি আবার একটু একটু করে বের হই।

হঠাৎ হঠাৎ চলে আসি বাসায়। একদিন দেখি, সে বাসায় নেই।

মোবাইলে ফোন দিই, রঞ্জু, তুমি কই?

ভাবির বাসায় এসেছি। আমার খালাতো ভাই মন্টুর ওয়াইফ। জানোই তো, আমাদের বাসার কেউ আমাকে দেখতে পারে না। একমাত্র এই ভাবিটা আমাকে পছন্দ করেন। তুমি বাসায় নাই, কী করব একা একা, চলে আসছি।

আচ্ছা, ঠিক আছে, থাকো।

এখন প্রায়ই সে মন্টু-ভাবির বাসায় যাচ্ছে।

একদিন ফোন করি মন্টু-ভাবিকে। রন্টুর কাছ থেকে তার নম্বরটা জোগাড় করতে হয়।

বলি, ভাবি, আমাকে চিনবেন না, আমি মিঠু।

ও, মিঠু মামা। আপনার কথা তো রন্টুর কাছে অনেক শুনছি।

আমি তো এখন মামা না, রঞ্জুর বর।

হ্যাঁ, তা তো জানি।

ভাবি, রঞ্জু তো প্রায়ই আপনার কাছে যায়, না?

না তো!

গত শুক্রবারেও তো গেছে আপনার বাসায়।

না তো! আপনার সাথে বিয়ে হওয়ার পর রঞ্জু কোনো দিনও আমার বাসায় আসে নাই।

ও, আচ্ছা আচ্ছা। আমি ভাবলাম, এত প্রিয় ভাবি—যেতেও পারে। না, ঠিক আছে।

আমি ফোন রাখি। আমার দুনিয়া ঘুরছে। আমার চারপাশের সবকিছু ঘুরে চলছে। এই ঘরদোর, টেবিল-চেয়ার, টেলিফোন—সবকিছু পরিক্রমণরত। সেই ঘোরার কোনো নির্দিষ্ট দিক নেই। সে একবার ডানে-বাঁয়ে, একবার ওপর-নিচে, একবার কোনাকুনি ঘুরে চলছে। আমার সমস্ত শরীরে ঘাম। আমার বমি পাচ্ছে। আমি পড়ে যাব। আমি মরে যাব। আমি নিঃশেষিত হয়ে যাব। আমার কিছু নেই। আমার অতীত নেই। আমার বর্তমান শূন্য। আমার ভবিষ্যৎ

অন্ধকার।

নিঃস্বতার নিঃসীমতা থেকে আবার উঠতে চেষ্টা করি। পা টলে। চোখে ঝাপসা দেখি।

তবু মনকে শক্ত করি। আমার চ্যালেঞ্জটা অনেক কঠিন একটা চ্যালেঞ্জ। হিলারি ও তেনজিং এভারেস্টের চূড়ায় উঠতে যে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, সাহস, একাগ্রতা আর পরিশ্রমের পরিচয় দিয়েছিলেন; আমাকে তা-ই করতে হবে।

এই পরীক্ষায় আমাকে পাস করতেই হবে।

পৃথিবীর সুন্দরতম নারীটিকে বাঁচাতে হবে পতন থেকে, পচন থেকে।

পৃথিবীর সমস্ত গোলাপ আর রংধনু আর প্রজাপতি আর নীল আকাশ সাদা মেঘ আর বউ-কথা-কও পাখি আর মোহনবাঁশির সুর আর সংগীত আর ভাস্কর্য আর চিত্রকলা আর কবিতার জন্য আমি সুন্দরীতমাকে ফেরাব। আমাকে পারতেই হবে। রন্টু, আমাকে পারতে হবে। মরহুম চেয়ারম্যান সাহেব, আমাকে পারতেই হবে।

আমি আবার যাই ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার বলেন, দেখেন, যে নিজে সুস্থ হতে চায় না, তাকে সুস্থ করা মুশকিল। আমি আবারও ওকে কাউন্সেলিং করি।

এবার ডাক্তার ইসরাফিল হক তাকে বসিয়ে দেন অন্য মাদকাসক্ত কয়েকজনের সামনে। তারা সবাই চেয়ারে গোল হয়ে বসা। রঞ্জুও তাদের মধ্যে। আমি আর ডাক্তারও সেই বৃত্তবন্দী কেদারাগুলোর একটাতে বসি।

ডাক্তার বলেন, সুরঞ্জনা, আপনি এদের বোঝান, মাদক কেন ছাড়া উচিত।

রঞ্জু কথা বলতে শুরু করে। সে বলে, মাদকের সবই খারাপ। এর কোনো ভালো দিক নাই। মাদক নিলে শরীরের এমন কোনো অরগান নাই, যেইটার ক্ষতি হয় না। চোখ খারাপ হয়, মাথা খারাপ হয়, হার্ট দুর্বল হয়, লাং, পাকস্থলী, কিডনি, লিভার—সবকিছুর ক্ষতি হয়। ব্রেন নষ্ট হয়, পায়খানার প্রবলেম হয়, পেশাবের প্রবলেম হয়, স্কিন ডিজিজ হয়, ঘুম নষ্ট হয়। মাথা ঠিকমতো কাজ করে না। অর্থাৎ শরীরের সবকিছুই নষ্ট করে ড্রাগস। তারপর যারা সুচ দিয়ে ড্রাগস নেয়, তাদের নানা অসুখ হয়। জন্ডিস হয়, যক্ষ্মা হয়। এইডস হতে পারে। অর্থাৎ ড্রাগস নিলে মৃত্যু হবেই। তারপর তার পরিবার ধ্বংস হয়। তার চরিত্র নষ্ট হয়। সে চুরি করে। টাকার জন্য সে যেকোনো অন্যায় করতে প্রস্তুত থাকে। সে নিজে মরে, পরিবারটাকে মারে। তাহলে আমাদের সবার কী করা উচিত? আমাদের সবারই উচিত মাদকের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করা।

মাদক ছেড়ে দেওয়া। অন্য কারও পরামর্শে কেউ মাদক ছাড়তে পারে না, যদি না নিজে থেকে ছাড়ে। কাজেই আমাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে, আমি ছাড়ব।

এই মেয়ে তো দেখছি জ্ঞানপাপী! এ তো সব জানে!

তাকে জিজ্ঞেস করি, এত কিছু তুমি কীভাবে জানলে?

আরে, আমি ডাক্তারের কাছে আজকে প্রথম আসছি না। এই সব লেকচার শুনতে শুনতে আমার কান পচে গেছে।

সবই যখন বোঝ, তাহলে ছাড় না কেন?

ছেড়ে দিয়েছি তো।

তাহলে আবার তোমার শরীরে এই সব পাওয়া যাচ্ছে কেন?

আরে, বললাম না, আমি আর খাই না। আগে খেতাম। সেসব রক্তে আছে। তাই পাওয়া যাচ্ছে।

আর শোনো, আমি মন্টু-ভাবিকে জিজ্ঞাস করেছি, তুমি ওনার কাছে যাও না।

এইবার সে খেপে যায়। কে বলছে যাই না? কে বলছে? সে হাতের কাছে যা পায় তা-ই ছুড়ে মারতে থাকে আমাকে। আমি কী করব!

রাইনার মারিয়া রিলকের *ডুয়িনো এলিজিতে* আছে : যদি আমি চিৎকার করে উঠি, দেবদূত-অনুশাসনের মধ্যে কে আমার কথা শুনতে পারবে। ওদের মধ্যে যদি কেউ হঠাৎ আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে, তাহলে আমি তার জোরালো অস্তিত্বের চাপে মিলিয়ে যেতে পারি। কেননা সুন্দর আর কিছুই নয়, ভয়ঙ্করের সূচনা, যাকে আমরা এখনো সহ্য করে যেতে সক্ষম এবং আমরা এত সমীহ-ভীত কারণ সে খুব শান্তভাবে উপেক্ষা করে আমাদের ধ্বংস করতে। প্রতিটি দেবদূতই ভয়ঙ্কর।

এই কবিতাটা যখন বিশ্ববিদ্যালয় ছুটি হয়ে গেলে আমাদের টিনে ছাওয়া বারান্দার রোদের মধ্যে বসে শীতের সকালে আমি পড়তাম, পড়শিরা মাকে বলত, আপনার এই ছেলেটা কি একটু পাগল নাকি, একা একা বিড়বিড় করে! তখন ওই পঙ্‌ক্তিগুলোর মর্ম বুঝতে পারিনি। এখন মনে হচ্ছে, আমি সেই পরিস্থিতিতে পড়েছি। পড়েছি এক ভয়ঙ্কর সুন্দরের পাল্লায়, যে অবজ্ঞা করে, করুণা করে এখনো আমাকে পুরোটা বিনাশ করেনি; আবার যাকে আমি এখনো সহ্য করে যাচ্ছি।

এই সেই ভয়ঙ্কর দেবদূত।

আমি তার ছুড়ে মারা জিনিসপাতির আঘাত দু হাতে মাথা ঢেকে সহ্য

করি। একসময় সে শান্ত হয়। একসময় সে অশান্ত হয়। এ-ই হচ্ছে এখন আমার জীবন।

আমি তাকে বলি, রিহ্যাবে চলো। ঢাকায় কতগুলো পুনর্বাসন কেন্দ্র হয়েছে, যেখানে মাদকাসক্তদের ভর্তি করে রাখা হয়। তাদের চিকিৎসা দেওয়া, ডিটক্স করা হয়, রিহ্যাবও করা হয়। মাস ছয়েক বা মাস তিনেক পর তাদের ছাড়া হয়। এরপর স্বজনদের ভালোবাসা আর নজরদারি যদি তাকে অসৎ সঙ্গ থেকে দূরে রাখতে পারে, তাহলে সে সুস্থ হয়ে ওঠে। অনেকে হয়েছে।

কিন্তু সে রিহ্যাবে যেতে অস্বীকৃতি জানায়। সে বলে যে সে ভালো হয়ে গেছে। আর সে কোনো ড্রাগ নেয় না।

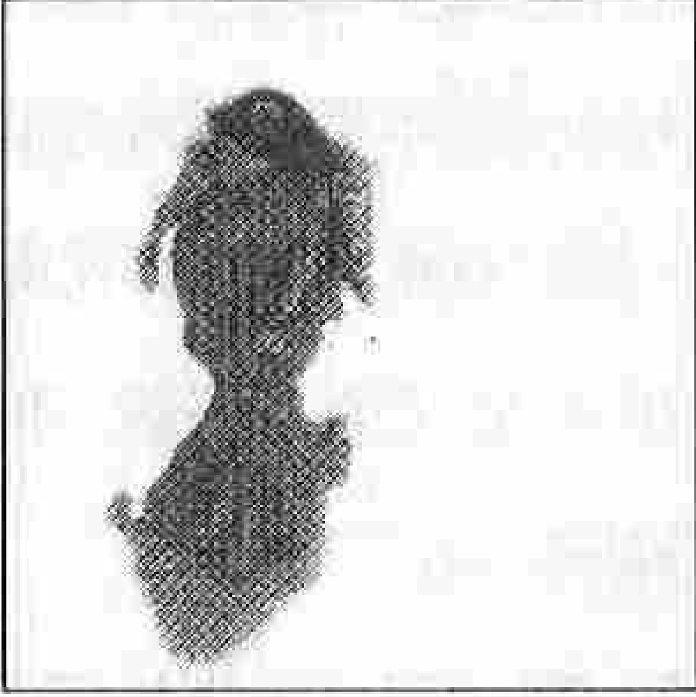
আমি বলি, তাহলে তুমি এমন করছ কেন?

করছি, কারণ আমার উইথড্রল সিনড্রোম হচ্ছে। এই কটা দিন। তারপর যখন শরীর থেকে বিষের প্রভাব একদম চলে যাবে, তখন দেখো, ঠিক হয়ে যাব।

আমি ভুল করি। আমি তার অতি সুন্দরভাবে বানানো কথার জাদুতে মোহাচ্ছন্ন হই। আই উড বি কনজিউম্‌ড্ ইন দ্যাট ওভারহোয়েলমিং একজিস্টেন্স।

অ্যান্ড আই অ্যাম অড।

তাকে আর রিহ্যাবে নিয়ে যাওয়া হয় না। আসলে কীভাবে নিয়ে যেতে হয়, সেটা আমি জানতাম না। আমি তার ওপর আস্থা রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম, সে চেষ্টা করছে। ভেবেছিলাম, সে সেরে উঠছে। ভেবেছিলাম, বিনাশের শেষ কিনার থেকে সে ফিরে আসছে।



টিভিতে অনুষ্ঠান করি। কবিতা লিখি। আমার বন্ধুবান্ধব-শুভাকাঙ্ক্ষী ঢাকা শহরে দু-চারজন আছেন।

একদিন আমার এক বন্ধু আমাকে ফোন করে, দোস্ত, কেমন আছ?

ভালো, ভালো আছি।

না দোস্ত, তুমি ভালো নাই।

না, আমি ভালো আছি।

আচ্ছা, তুমি আসো। তোমার সাথে কথা আছে।

আমি তার অফিসে যাই। স্টেডিয়ামের দোতলায় তার বিজ্ঞাপনী সংস্থার অফিস। চমৎকার অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা। এসি কাজ করছে এই সেপ্টেম্বরেও। আমার বন্ধুটি শ্মশ্রুমণ্ডিত। তার কপালে নামাজ পড়ার দাগ। সে পরেছে জিন্স আর টিশার্ট। সে চমৎকার গানও করতে পারে খালি গলায়। আমাদের বন্ধুমহলে সবচেয়ে আকর্ষণীয় চরিত্র।

সে বলে, দোস্ত, চা খাও। দার্জিলিং থেকে চা-পাতা আনাইছি। দুধ-চিনি ছাড়া খাও। স্মেলটা টের পাইবা। ফ্লেবার।

আমি আসল প্রসঙ্গের জন্য অপেক্ষা করি।

সে বলে, দোস্ত, তুমি না বিয়া করছ?

হ্যাঁ, করছি তো।

হ্যাঁ, তোমার বউকে দেখছি তো টেলিভিশনে।

ও, আমি যে একটা অনুষ্ঠানে ওকে নিয়ে সাক্ষাৎকার দিয়েছি?

হ্যাঁ। শোনো, আমি অ্যাড ফার্ম চালাই। নানা লোকের সাথে চলি। তোমার বউয়ের নাম তো রঞ্জু, না?

হ্যাঁ।

ভাবি কিন্তু খুব খারাপ একটা সার্কেলে চলাফেরা শুরু করছে। তুমি একটু

খেয়াল রাইখো।

কী বলিস! কাদের সাথে মেশে রে?

আরে, এই শহরে ড্রাগ অ্যাডিক্টেড একটা পার্টি আছে। তাদের সাথে ঘোরে। এইখানে-ওইখানে যায়।

হা। আমার বন্ধুর কাছে এখন আমাকে নসিহত শুনতে হচ্ছে নিজের স্ত্রীকে দেখে রাখার ব্যাপারে। আমার বুক ভেঙে কান্না আসতে চায়। নিজেকে সামলে নিয়ে আমি বলি, থ্যাঙ্ক ইউ দোস্ত। তোরা আমার নিজের লোক। তোরা আমাকে সাবধান না করলে কে করবে।

ওর দার্জিলিং-চা আমার কাছে ইঁদুরমারা বিষের মতো বিস্বাদ লাগে।

আমি বাসায় ফিরি। দেখি, সে নেই।

আমি গুম হয়ে বসে থাকি। মোবাইলে ফোন দিই, সে ধরে না।

অনেকক্ষণ পর সে নিজেই ফোন করে।

আমি বলি, তুমি কোথায়?

সে বলে, এই তো আমার ইকেবানার টিচার ডাকছে। তার ক্লাসে ছিলাম। জাপানের রানি আসতেছে। তার অনারে একটা এক্সিবিশন হবে।

তুমি ইকেবানার টিচারের কাছে যাবা, আমাকে বলে যাবা না?

তোমাকে ফোন দিলাম তো। ফোন যাচ্ছিল না।

এত চমৎকার অজুহাত দিতে পারত সে! ফেরার সময় আনে একগোছা ফুল আর পাতা। একটা মাটির সানকি নিয়ে মুহূর্তেই বানিয়ে ফেলে চমৎকার একটা ইকেবানা। দেখে আমার সব রাগ-ক্রোধ জল হয়ে যায়। আমি তাকে আমার আলিঙ্গনের মধ্যে টেনে নিই, তাকে পিষে মারতে মারতে বলি, তুমি এত সুন্দর, তোমার এত গুণ! শুধু তোমাকে একটা কাজ ছাড়তে হবে। অ্যাডিক্টেড বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আর মেশা চলবে না।

সে বলে, না, আমার কোনো অ্যাডিক্টেড বন্ধুবান্ধব নাই তো।

আমি তাকে বিশ্বাস করব কি করব না বুঝতে পারি না।

রাতের বেলা আমার ঘুম ভেঙে গেলে আমি দেখি, সে নেই। বিছানা ফাঁকা। বারান্দা থেকে আসা আলোর টুকরো বিছানার মধ্যে বিভ্রম সৃষ্টি করে রেখেছে। কই গেল!

বাথরুমে? না, বাথরুমেও নেই।

দরজা খুলে বাইরে চলে গেল নাকি! দরজায় যাই।

দরজা বাইরে থেকে তালা দেওয়া।

আমার পাগল হওয়ার দশা হয়। আমি মোবাইল ফোন তুলে নিয়ে তাকে ফোন করি। সে ফোন ধরে না।

আমি আবার ফোন করি। আবার ফোন করি। বাইরেও যেতে পারি না। চিৎকার করে পড়শিদের জাগাতেও পারি না। আমার কী হবে এখন!

অনেকক্ষণ পর সে ফিরে আসে। আমি তার কাঁধ জোরে ঝাঁকি দিয়ে বলি, কোথায় গেছিলা তুমি?

তার চোখে আবার সেই সাপের দৃষ্টি। সে চোখ দিয়ে নীরব হিসহিসানি তুলে বলে, আমার খুব একা একা রিকশা দিয়ে ঘুরতে ইচ্ছা করতেছিল। তাই ঘুরে আসলাম।

আমাকে ডাকতা। আমিও তোমার সাথে যেতাম।

আমার একাই যেতে ইচ্ছা করছিল।

আমি কী বলব!

একদিন রাতের বেলা। সে আমার পাশে শুয়ে আছে। আমি ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙে মোবাইলের শব্দে। উঠি। দেখি, সে নেই। মাথা তুলে বুঝতে পারি, সে বাথরুমে। আমি ওর মোবাইলটা হাতে নিই। দেখি, একটা এসএমএস এসেছে। আমার মাথায় কী ভূত কাজ করে। আমি মেসেজটা পড়তে যাই। আমার সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠে বিবমিষায়।

tomar nil ranger bra tule jafran botai dei onek ador.

এই সব কী! এই সব কী!

আমি রিসিভ্‌ড মেসেজগুলোয় ঢুকে পড়ি। এই রকম আরও নানা বাজে বাজে কথায় ভরা মেসেজ। আমি সেন্ট মেসেজ অপশনে যাই। দেখতে পাই, সেও এই সব মেসেজের জবাব দিয়েছে। 'এই দুষ্টু! এই, পাগলামো করে না। ঘুম আসছে না গো'—এই সব নানা কথা দিয়ে।

সেই রাতে একটা মহা যুদ্ধ হয়ে যায়। আমি তাকে বলি, এই সব কী?

সে বলে, আমি কী জানি! আমি মেসেজ পাঠাইছি নাকি! কে না কে পাঠাইছে। আমি তাকে চিনিও না।

আমি বলি, অবশ্যই চেনো। এই যে তুমি রিপ্লাই দিছ!

রিপ্লাইয়ে কি আমি বলছি, আমি তাকে চিনি?

অবশ্যই তাকে তুমি চেনো।

না, আমি চিনি না। পারলে তুমি ফোন দিয়া জিজ্ঞাস করো সে কে।

আমি কেন জিজ্ঞাস করব? আমি খেপে যাই। আমার মধ্যে বাইসনের গোঁয়ার্তুমি আর ক্রোধ।

সেও খেপে যায়, খবরদার, একটা কথা বললে...সে চেয়ার তোলে আমাকে মারার জন্য।

আমি দাঁতে দাঁত চেপে বলি, খবরদার, খুন করে ফেলব।

সে চেয়ার ছুড়ে মারে আমার মাথায়। আমি দু হাত মাথায় তুলে কোনোরকমে মাথাটা বাঁচানোর চেষ্টা করি। তবু চেয়ারের কোনা লেগে আমার মাথা যায় ফেটে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোয়। বিছানা রক্তে লাল হয়ে যায়। সে দেখে বোধহয় খানিকটা ঘাবড়ে যায়। আমিও যাই।

সে দরজার ছিটকিনি খুলে রাত সাড়ে তিনটায় বেরিয়ে যায়।

আমাকেও বেরোতে হয়। তালা দিয়ে বেরিয়ে আমি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে যাই রিকশায়। রিকশাওয়ালা আমার রক্তাক্ত অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে প্রথমে পালাতে চেয়েছিল। পরে দয়াপরবশ হয়ে আমাকে নিয়ে আসে।

ডাক্তার বলে, কী হয়েছিল?

আমি বলি, বাসায় ফিরছিলাম কাজ সেরে। ছিনতাইকারী হাতের চেলাকাঠ দিয়ে বাড়ি দিয়েছে।

দু-তিন দিন বিভিন্ন কাগজে এই খবর ছিল, মিঠুর মাথায় আঘাত করেছে ছিনতাইকারী।

পরের দিন বিকেলে সে বাসায় ফিরে আসে। সব স্বাভাবিক। যেন কিছুই হয়নি।

আমি বলি, কই ছিলা ভোররাতে? সারা দিন?

সে বলে, রিকশায় ঘুরছি।

এরপর এসএমএস আসতে থাকে আমার মোবাইলে। মেসেজের বিষয় : রঞ্জুর মতো মেয়ের তুই যোগ্য নোস। ওকে কেন তুই আটকে রেখেছিস?

এসএমএসের অত্যাচারে আমার জীবন অতিষ্ঠ হবার জোগাড়। আমি মোবাইল কোম্পানিতে অভিযোগ করি। থানায় জিডি করি। এসএমএসের প্রাবল্য কমে আসে।

কিন্তু রঞ্জুকে আমি আর আটকাতে পারি না। সে আমার কোনো কথা শোনে না। দিনে-রাতে যখন খুশি বাইরে যায়। তার নামে নানা কুৎসা আমাকে

শুনতে হয় নানাজনের মুখ থেকে।

একদিন বাসায় এসে দেখি, আরেকটা মেয়ে বসে বসে সিগারেট খাচ্ছে। কারও চেহারা নিয়ে কথা বলা উচিত নয়; কিন্তু সাজপোশাক, অভিব্যক্তি নিয়ে নিশ্চয়ই মন্তব্য করা চলে। সেই মেয়েটিকে দেখে আমার দেহপসারিণী ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না।

রঞ্জু পরিচয় করিয়ে দেয় তার বন্ধু বলে। সে জানায়, একটা ভালো বিজ্ঞাপনের মডেল হওয়ার অফার তারা পেয়েছে।

মেয়েটি বলে, খুব বড় কোম্পানি। শুটিং হবে ব্যাংককে।

আমি বলি, ব্যাংককে শুটিং। কোন কোম্পানি?

তারা কোম্পানির নাম বলে না।

আমি বলি, কোন অ্যাড এজেন্সি, আমাকে বলো। আমি তো সবাইকে চিনি।

তারা বলে না।

কোন প্রডাক্ট, সেইটা বলো।

তারা গাঁইগুঁই করে।

মেয়েটা চলে গেলে রঞ্জু আমার ওপর খেপে যায়। বলে, আমি একটা ভালো কাজের অফার পাইছি, আর তুমি এত কথা বললা!

আমি বলি, আরে, কথা কোথায় বললাম! আমি তো শুধু জানতে চাইলাম, কোন প্রডাক্ট, কোন এজেন্সি, ডিরেক্টর কে।

সে বলে, তুমি চাও না আমি মডেলিং করি। বিখ্যাত হই। তোমার চেয়ে ফেমাস হই।

আমি বলি, খুব চাই। তবে এই জগৎটা সম্পর্কে তোমার চেয়ে আমি একটু বেশি জানি। কারণ টিভিতে আমি প্রোগ্রাম করি। তুমি বলো, কী বৃত্তান্ত না বৃত্তান্ত। তাইলে তোমাকে আমি হেল্‌প্ করতে পারব।

লাগবে না তোমার কোনো হেল্‌প্, সে চিৎকার করে। আমি যাবই ব্যাংকক।

আমি বলি, আচ্ছা, ঠিক আছে। চলো, আমিও তোমার সাথে যাব।

হাজব্যান্ড সাথে নিয়া কোনো মডেল শুটিং করতে যায় না।

আমি এবার একটা ঈদের অনুষ্ঠান করছি। খুবই ব্যস্ত তার শুটিং নিয়ে। পরিকল্পনা নিয়ে।

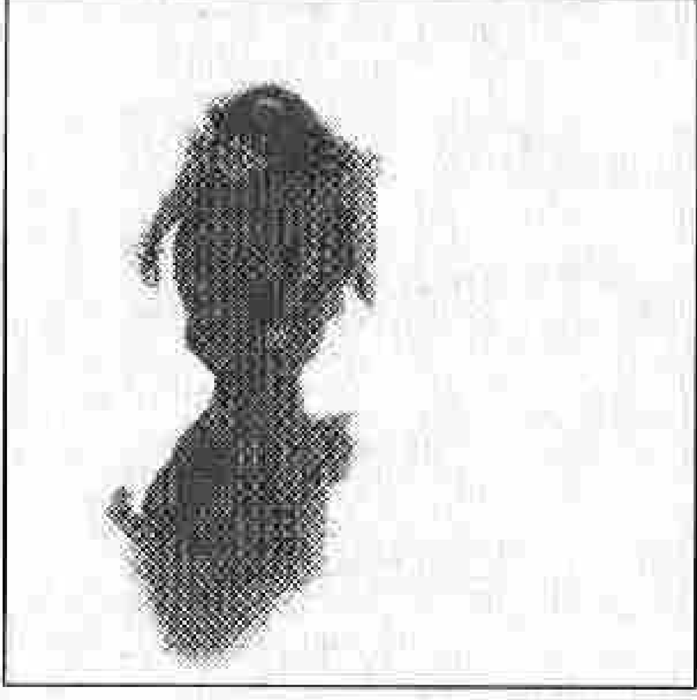
একদিন গভীর রাতে বাড়ি ফিরে দেখি, রঞ্জু নেই।

পরের দিন সে আসে না। পরের দিনও আসে না।

এক সপ্তাহ পর একদিন শুটিং শেষে ঘরে ফিরে দেখি, সে বিছানায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে।

আমি তার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিই।

মেঝেতে বিছানা করে শুয়ে পড়ি।



ওর সঙ্গে কথা বলি না। ও ওর মতো চলছে, আমি আমার মতো। এর মধ্যে একদিন রন্টুর সঙ্গে দেখা হয়। আমি তাকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে বলি, রন্টু, মনে হয় তুমিই ঠিক। রঞ্জুকে ভালো করা আমার পক্ষে সম্ভব না।

রন্টু বলে, আমি জানতাম, মিঠু মামা। আমি সেই জন্যই আপনাকে তার কাছ থেকে দূরে রাখার সব চেষ্টা করছিলাম।

তারপর সে আমার কাঁধে হাত রাখে। আমি তাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকি।

তারপর একদিন টিভি চ্যানেলের অফিসেই আমি আমার ইয়াহু মেইল চেক করছিলাম ইন্টারনেটে। কে যেন মেইলে একটা ছবি পাঠিয়েছে। খুলতে সময় নেয়। ছবিটা খুললে অন করেই আমার সমস্ত পৃথিবী নাই হয়ে যায়। একটা টপলেস ছবি। রঞ্জুর। হাতে একটা মোবাইল ফোন। কেউ একজন তার ছবি তুলছে, এ বিষয়ে সে নির্বিকার!

আমি যেন পাথর। পৃথিবীর কোনো কিছুতেই আমার আর কিছুই যাবে-আসবে না। ওই দিনই আশ্চর্যজনকভাবে আমার কোনো উপকারী বন্ধু ছবিটা আমার মোবাইলে এমএমএস করে পাঠিয়ে দিয়ে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়।

আমি বাসায় ফিরি। সে বাসায় নেই।

সেও এক শীতের রাত। তবু আমার মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে। আমার এমনই অস্থির লাগে।

সে বাসায় ফেরে মধ্যরাতের পর।

আমি মাথা ঠান্ডা রেখে বলি, হাত-মুখ ধোও। খেয়ে নাও।

সে বলে, খেয়ে এসেছি।

হাত-মুখ না ধুয়েই সে বিছানায় শুয়ে পড়ে।

আমি বলি, ওঠো, তোমার সাথে কথা আছে।

কী কথা?

আমি তাকে মোবাইল খুলে তার ছবিটা দেখাই।

সে বলে, দেখছি। এই ছবি তুমি কখন তুললা?

আমার মাথায় রাগ চড়ে বসে। আমি তার গালে ঠাস করে একটা চড় মেরে বসি।

সে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

আমি বলি, খবরদার, আর ফিরবে না। খবরদার!

এক শীতের রাতে সে, সুন্দরীতমা, আমার কাছে এসেছিল; আরেক শীতের রাতে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে আমি কিছুটা নির্ভার বোধ করি।

পরের দিন আমিও আর বাসায় ফিরি না। আবার উঠি সেই ইন্টার্নি হোস্টেলে।

ফয়সালা নামের একটা এনজিও ধরনের আছে, যারা পারিবারিক সমস্যার আইনি সমাধান দেয়। আমি তাদের কাছে যাই। তাদের কর্মকর্তা আইরিন বেগম একজন অ্যাডভোকেট। আমি তাঁকে আমার সমস্যাটা খুলে বলি। আমি বলি যে আমি ডিভোর্স চাই।

তিনি বলেন, ডিভোর্স তো কোনো ব্যাপার না। আমাদের আইনে একজন পুরুষ দেনমোহরানার টাকা পরিশোধ করে খুব সামান্য অজুহাত দেখিয়েও ডিভোর্স নিতে পারে। এমনকি সে বলতে পারে, বউয়ের দাঁত কেন একটা কম। তাহলেও ডিভোর্স হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের কি একবার চেষ্টা করে দেখা উচিত না, যদি তাকে সুস্থ করা যায়?

আমি বলি, তার ফ্যামিলি তাকে ত্যাগ করেছে। তার নিজের ভাই বলে দিয়েছে, এইটা একটা অসম্ভব কেস। আমি তার স্বামী, তাকে প্রাণপণে ভালোবাসি। আমি ট্রাই করে পারি নাই। আর আপনি বলছেন, আরেকবার চেষ্টা করবেন; করেন। আমার কোনো আপত্তি নাই। ও যদি ড্রাগস ছেড়ে দেয়, আমি তাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি।

আচ্ছা, ঠিক আছে।

আমি বলি, আমি তাকে আনতে পারব না। আপনারা তাকে যেমন করে পারেন, আনেন। এই হলো আমার ঠিকানা। আর এই হলো তার নম্বর।

ফয়সালা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছিল। তারা তাকে ফোন করে তার

বাসায় দেখা করে। তার সঙ্গে বন্ধুত্বের অভিনয় করে তাকে ফয়সালা অফিসে আনে। তাকে আবার মাদকমুক্তি-বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে কাউন্সেলিং করা হয়।

আমাকে ফোন করে করে আইরিন বেগম সেসব বর্ণনা করতেন।

আমি হাসি। কাউন্সেলিং! আপনি তাকে দিয়ে অন্য ড্রাগ অ্যাডিক্টেডদের কাউন্সেলিং করাতে পারবেন। ও এই সব এত জানে! তাতে ওর দুইটা পয়সা আসলে ড্রাগস নিতে আরও সুবিধা হবে।

আমার কথা সত্য বলে প্রমাণিত হয়। কাউন্সেলিং দিয়ে হবে না, ওরা বোঝে। আমার কাছে ওরা সম্মতি চায় ব্লকার ব্যবহার করতে। শরীরের ভেতরে এমন ওষুধ দিয়ে দেওয়া হবে, যাতে ওর শরীর আর ড্রাগস না নেয়। আমি লিখিতভাবে অনুমতি দিয়ে আসি।

মাস দুয়েক পর ফয়সালা জানায়, তারা ব্লকার দিয়েছিল। রঞ্জু বাইরে গিয়ে অপারেশন করিয়ে সেটা বের করে নিত। তারপর ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করার আগে আবার পরে আসত।

এটা নিয়ে ডাক্তার প্রশ্ন তোলায় সে চেয়ার তুলে ডাক্তারকে মেরে পালিয়ে গেছে।

এবার তারা নিঃসন্দেহ হয়েছে, আমার ডিভোর্স নেওয়া উচিত।

মনোমালিন্য হওয়ায় আমি বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করছি; ফয়সালার দেওয়া কাগজে আমি সই করি।

সিটি করপোরেশন থেকে তার কাছে নোটিশ যায়। সে আমাকে ফোন করে বলে, সে মামলা করবে। আমি তার ওপর শারীরিক ও মানসিক নানা নির্যাতন করেছি।

আমি বলি, করো।

সে বলে, কীভাবে প্রমাণ করবে, আমি অ্যাডিক্টেড? কাগজপত্র সব আমার কাছে। আমি সব পুড়িয়ে ফেলব।

আমি বলি, টেস্ট করালেই বের হবে। ম্যারাডোনা যে ড্রাগস নিত, সেইটা কি সে লুকাতে পেরেছিল! লুকানো যায় না।

সে ফোনের মধ্যেই পারলে আমাকে মারতে আসে।

আমাকেও শুনানির জন্য হাজির হতে বলা হয় সিটি করপোরেশন থেকে। আমি যাই নির্ধারিত দিনে। আমার ভেতরে প্রস্তুতি ছিল যে সে আসবে। কোনো জাঁহাবাজ উকিল সঙ্গে করে আনবে। তাকে যে আমি অনেক মারধর করেছি, সেসব বলে পরিবেশকে তার পক্ষে টেনে নেবে।

কিন্তু সে অনুপস্থিত থাকে।

ফয়সালার মধ্যস্থতায় আমাদের ডিভোর্স হয়ে যায়।

আমাকে এক লাখ নিরানব্বই হাজার এক টাকা দেনমোহরানা নিয়মিত মোট ছয়টি কিস্তিতে ফয়সালার মাধ্যমে এক বছরের মধ্যে শোধ করে দিতে হবে।

পরে পরেও রঞ্জু আজিমপুরের ওই বাসাতে কিছুদিন ছিল। যে কদিন ছিল, আমি বাসাওয়ালার বাসায় ফোনে যোগাযোগ করে লোক-মারফত বাসাভাড়া পৌঁছে দিয়েছি।

অনেক কষ্ট হলেও ফয়সালাকে দেনমোহরানার টাকার কিস্তি শোধ করেছি প্রায় নিয়মিতভাবে।

বরং কোনো মাসে যদি চেক পাঠাতে আমি দেরি করতাম, রঞ্জুই ফোন করত আমাকে। টাকাটা পাঠাও। লাগবে।

কী কাজে লাগবে, আমি তো জানি।

এক বছর পেরিয়ে যায়। সব দায়ভারমুক্ত হয়ে আমি হাঁপ ছাড়ি।

তবু একলা রাতে মাঝেমধ্যে ঘুম ভেঙে যায় দুঃস্বপ্ন দেখে।

দেখি, সে এখনো আমার স্ত্রীই আছে, আর আমারই ঘরে শুয়ে আছে অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে।

আমি বলি, ছি রঞ্জু, এসব কী করছ!

সে বলে, ড্রাগসের টাকা দেবে তো লোকটা। তোমার সাথে ঘুমাতে পারলে ওর সাথে ঘুমানো যাবে না কেন?

ঘুম ভেঙে গেলে আমার খুব কষ্ট হয়। উঠে পানি খাই। পায়চারি করি।

লোকমুখে নানা কথা শুনতে পাই। আমার নিজেরই সে স্ত্রী ছিল, সেই সব কথা শোনাও আমার জন্য পাপ।

যতই সেসব কথা মনে পড়ে, ততই মনটা কুঁকড়ে কেঁচো হয়ে যায়। আলো জ্বেলে নিয়ে বিনয় মজুমদার থেকে আবৃত্তি করি একবার, একবার জীবনানন্দ থেকে।

জানালার বাইরে ঘুমন্ত ঢাকার রাত। হঠাৎ হঠাৎ পাহারাদারদের বাঁশি। ওই দূরে কত ভবনের সারি! কোনো কোনো ভবনে এখনো আলো জ্বলছে। কেন জ্বলছে? কে আছে ওখানে এত রাতে?

বারান্দায় যাই। আকাশের দিকে তাকাই। কুয়াশা ভেদ করে কিছু তারা

এখনো জ্বলছে আকাশে। এই রুপালি আগুনভরা রাতে সুন্দরীতমাটি এখন কোথায় কোন যুবকের সঙ্গে? যুবক, নাকি আর কেউ? সে আমার কাছে ফিরে এলে হয়তো তাকে আর নেব না, তবু সে ফিরে আসুক, মৃত্যুময় ওই পচন-দুর্গন্ধি জীবন থেকে প্রাণময় শুচিস্নিগ্ধ নেশাহীন সুস্থ জীবনে।

খুব শৈশবের কথা মনে পড়ে। বিদ্যুৎ চলে গেলে গরমের রাতে আঙিনায় মাদুর পেতে আমরা শুয়ে পড়তাম। খালি-গা ছোট ছোট ভাইবোনেরা সব। বাবাও খালি-গা। মা হাতপাখা ঘোরাচ্ছেন।

আকাশে তখন অনেক তারা উঠত।

আজ আর অত তারা ওঠে না। বাবা বেঁচে নেই। থাকলে জিজ্ঞেস করা যেত, বড় হলে আকাশের তারা কমে যায় কেন।

কান্না পাচ্ছে। মনটা দুর্বল। মন দুর্বল হলেই কেবল মানুষের এই সব কথা মনে পড়ে—শৈশবের কথা, মৃত স্বজনের কথা।

আমি বারান্দায় কেন দাঁড়িয়ে?

শৈশবের পড়শিনী ঠিকই বলেছিল—আমার মাথাটা অনেকটাই খারাপ। না হলে কেউ মধ্যরাতে উঠে বিড়বিড় করে কবিতা পড়ে!

তারা ঝরে পড়ছে। সব তারা ঝরে গেল। আকাশে আর কোনো তারা নেই। আকাশে কিছুই নেই। আকাশে আকাশও নেই।

==================